নন্দিত নরকে

হুমায়ূন আহমেদ

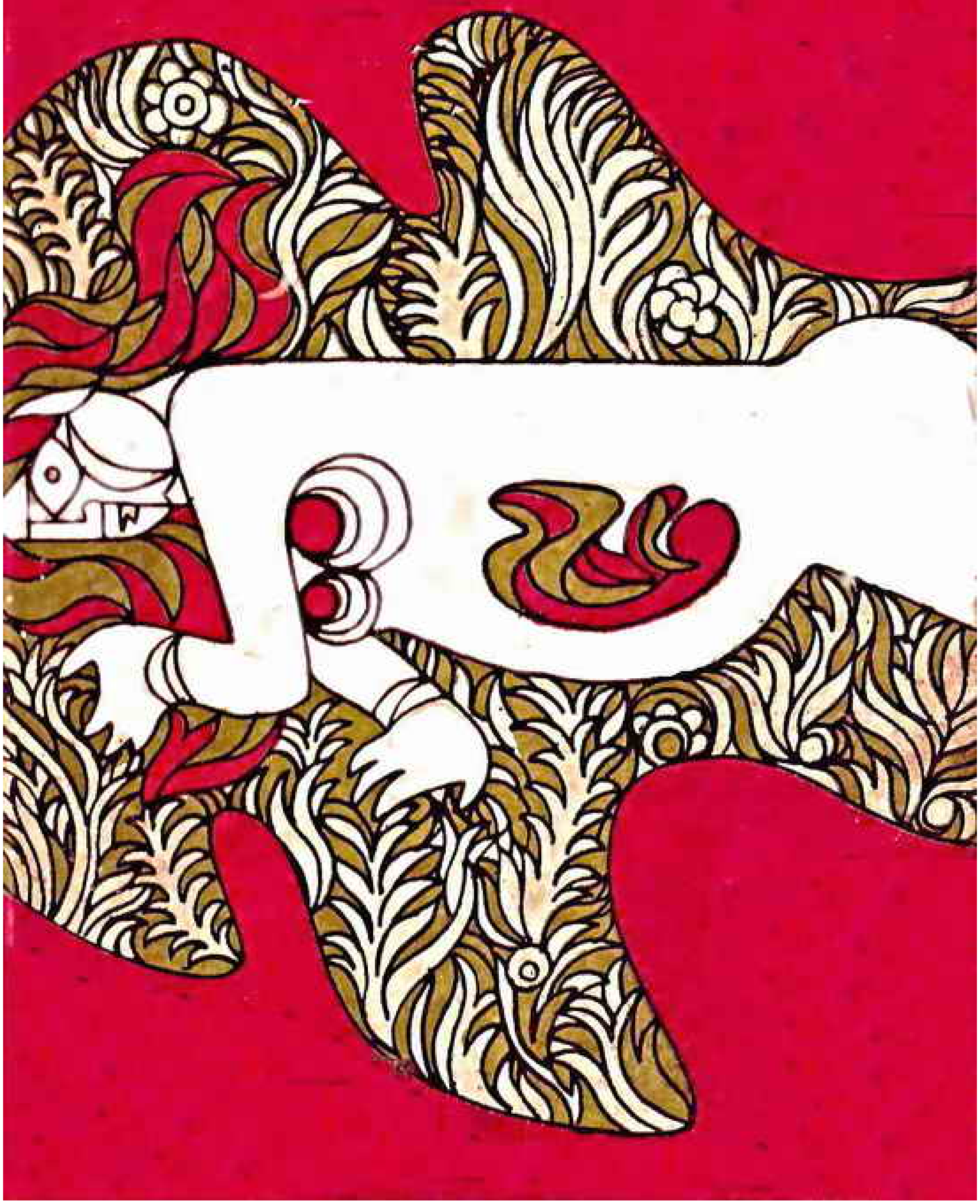

লেখকের যেন কোন বক্তব্য নেই, কোন দৃষ্টিকোন নেই, আশ্চর্য এক নির্লিপ্তির সাথে তুমি তোমার গল্প বলে গেছ, গল্প বলা তো নয় এ যেন ছবি আঁকা। যাতে একটি রেখাও অযথা টানা হয়নি। আমাকে সবচে বিস্মিত করেছে তোমার পরিমিতিবোধ আর সংযম। এত অল্প বয়সে রচনায় এমন সংযম খুব কম দেখা যায়। তোমার লেখনী জয়যুক্ত হোক।

—আবুল ফজল

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সুক্ষ্মদর্শী শিল্পীর, একজন কুশলী স্রষ্টার পাকাহাত। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্ম লগ্ন যেন অনুভব করলাম।

—ডঃ আহমদ শরীফ

বইখানা পড়বার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে, নতুন করে যে কথা আমি বলতে পারতাম, সে কথা বলবার সময় এখনো আসেনি।

—সরদার জয়েন উদ্দীন (বই, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র)

হাসান হাফিজুর রহমান 'নন্দিত নরকের' প্রসঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করলেন। 'নন্দিত নরকের' লেখক নাকি তাঁকে পুতুল নাচের ইতিকথার অসামান্য কথাশিল্পীকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহও উৎসাহিত আলোচনা করলেন 'নন্দিত নরকে' সম্পর্কে। বইটি পড়তেই হবে আমাকে। দোকানে গিয়ে পেলাম না।

—মৈনাক (দৈনিক বাংলা)

একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠতে ইচ্ছা করে না। তিনি যে একজন বিশিষ্ট জীবন শিল্পী তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন।

—দৈনিক পূর্বদেশ

হৃদয় দিয়ে লেখা অন্তরঙ্গ গাঁথা।

—বিচিত্রা

ভূমিকা

মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর, একজন কুশলী স্রষ্টার পাকা হাত। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।

জীবনের প্রাত্যাহিকতার ও তুচ্ছতার মধ্যেই যে ভিন্নমুখী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির জটাজটিল জীবনকাব্য তার মাধুর্য, তার ঐশ্বর্য, তার মহিমা, তার গ্লানি, তার দুর্বলতা, তার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, তার শূন্যতার যন্ত্রণা ও আনন্দিত স্বপ্ন নিয়ে কলেবরে ও বৈচিত্র্যে স্ফীত হতে থাকে, এতো অল্প বয়সেও লেখক তাঁর চিন্তা চেতনায় তা ধারণ করতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত।

বিচিত্র বৈষয়িক ও বহুমুখী মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই যে জীবনের সামগ্রিক স্বরূপ নিহিত, সে উপলব্ধিও লেখকের রয়েছে। তাই এ গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক মানুষের ভীড়, বহুজনের বিদ্যুৎ দীপ্তি এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আপাত নিস্তরংগ ঘরোয়া জীবনের বহুমুখী সম্পর্কের বর্ণালি কিন্তু অসংলগ্ন ও বিচিত্র আলেখ্যর মাধ্যমে লেখক বহুতে ঐক্যের সুষমা দান করেছেন। তাঁর দক্ষতা ঐ নৈপুণ্যেই নিহিত। বিড়ম্বিত জীবনে প্রীতি ও করুণার আশ্বাসই সম্বল।

হুমায়ুন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবন শিল্পী হবেন—এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **ডঃ আহমদ শরীফ**

১৬।৬।৭২

রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা ক'টিই বার বার বলছিলো।

রুনুর মাথা নীচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকি-ঝুঁকি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বুঝার কিছুই নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিলো। হয়তো সে কেঁদেই ফেলতো। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম,

ছিঃ রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ। এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস।

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়। আমি তাকে তুই বলি। পিঠাপিঠি ভাই ভাই-বোনেরা একজন আরেক জনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুমি বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোট বোন সুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনলো। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিলো। আমার কথায় তার ভাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরী বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বললো। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে। গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু'একটি কৌতুহলী চোখ কি হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বললো,

আমি আবার বলবো।

বেশ।

কি হয় বললে ?

আমি কাতর গলায় বললাম,

সে ভারী লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।

তবে যে ও আমাকে বললো।

কে ?

আমি বুঝতে পারছি রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথায়ও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগস্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য কথা কেউ বলতে পারে ভাবিনি।

আমি বললাম,

কে বলেছে ?

আজ সকালে বলেছে।

কে সে ?

ঐ যে লম্বা ফর্সা।

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোন পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়া বেড়াতে বেরুবে, আবারো হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।

খোকা তোর দুধ।

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝ রাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম, 'তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে খোকা ?'

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার

উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, অল্প মাথা ব্যথা, এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন,

খোকা তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে?

তোষকের নীচে আমার ডাক্তারখানা। এ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় টেবলেট জমানো আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের টেবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথায় যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হারিকেন জ্বালানো হয়। ঘুমুবার সময় রুনু হারিকেন নিবিয়ে দেয়। আলোতে রুনুর ঘুম হয় না। বাবা বললেন,

খোকা পেয়েছিস?

হুঁ। কি হয়েছে?

তোর মার জ্বর।

জ্বরে এ্যাসপিরিন কি হবে?

খুব মাথা ব্যথাও আছে।

অ।

তিনটি টেবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগানো পঁচিশ পাওয়ারের বালবের আলো এসে পড়লো। কি বাজে ব্যাপার। একটিও এ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন,

ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না?

মনে পড়লো ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি বৃষ্টল সিগারেট রয়েছে। সারাদিনে পাঁচটার বেশী খাবো না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর এখন এই মধ্যরাত্রে একটাতো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষণের ভেতরেই একটা সিগারেট ধরাবো,

এতেই মনটা ভরে উঠলো। বাবা এ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়লো রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ী পাকিয়ে পুটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকেনা। মশারীও থাকেনা। মশারীর আব্রুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবার গলা শোনা গেল।

নাও শানু নাও খেয়ে ফেলো টেবলেটটা।

আশ্চর্য। বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন। আমার লজ্জা করতে লাগলো। বাবা আবার ডাকলেন,

শানু, শানু।

শহানা নামটাকে কি সুন্দর করে ভেঙ্গে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দু'হাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোষকের নীচে চারটা ভেলিয়াম টু টেবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমানোর জন্য দু'টি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারো হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে চিন্ চিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা' এই বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে উঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব ক'টি কথা

আমার জানা। মা বলেন, 'আহা করো কি ? ছিঃ।'

বাবা ফিস ফিস করে কি বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দু'হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকের শব্দটা সে সময় বড় বেশী স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়। রুনু আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজ বিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারান্দার এক পাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনাহানা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতের বেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার মত হয়। হাস্নুহেনার গন্ধে নাকি সাপ আসে। মন্টু এই গাছের নীচেই একবার একটা মস্ত সাপ মেরেছিল। চন্দ্রবোড়া সাপ। মা দেখে আঁৎকে উঠে বলেছিলেন,

কি করলিরে মন্টু এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে।

আমি যদিও এসব বিশ্বাস করতামনা তবু আমারো ভয় লাগছিলো, আমি তন্ন তন্ন করে অন্য সাপটাকে খুঁজলাম। বাড়ীর চারপাশে কার্বলিক এসিড দেয়া হলো। মাষ্টার চাচা বললেন, 'যে সাপটা রয়ে গেছে সেটা পুরুষ সাপ।' সাপ দেখে তিনি স্ত্রী পুরুষ বলতে পারতেন। ক'দিন সবাই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম। যদিও সেই পুরুষ সাপটিকে কখনো দেখা যায়নি।

রাবেয়া বললো, 'মা আমি দুধ খাবো।'

suman_ahm@yahoo.com

মার কাল রাতে জ্বর এসেছিল। তাঁর মুখ শুকিয়ে ছোট্ট

ভোরেই বাড়ী থেকে পালাব। আর কখনো আসবো না।

মা আমাকে দুধ দাও।

রাবেয়া জেদ করতে লাগলো। আমি বাটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মা মৃদু কণ্ঠে বললেন,

আহা খা না তুই, তোর পরীক্ষা।

দুধের বিলাসিতাটুকু আমার জন্যেই। সামনেই এম. এস-সি- ফাইনাল, রাত জেগে পড়ি। নয় টার দিকে মা দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধে চুমুক দিতেই মা নীরবে রাবেয়ার শাড়ী থেকে একটি একটি করে সেফটি পিন খুলতে থাকেন। রাবেয়ার শাড়ীতে গোটা দশেক সেফটি পিন সারাদিন লাগানো থাকে। সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায়। তার অনাবৃত শরীর ভুলেও যেন কারুর চোখে না পড়ে এই ভয়েই মা এ করেন। রাবেয়াকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না—তাকে সালোয়ার-কামিজও পরানো যাবে না। তার সে বয়স নেই। অথচ সবাই রাবেয়ার দিকে

তা জানেনা তবু সে হাসে। কারণে অকারণে হাসে। রাবেয়ার কপালে ঠিক মাঝখানে একটা কাটা দাগ আছে। ছোটবেলায় চৌকাঠে পড়ে গিয়েছিল। দুধ শেষ করে রাবেয়া বলল,

বাজে দুধ। ছিঃ!

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'শুভাপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবি একবার?' শুভাপুরে এক পীর সাহেব থাকেন। পাগল ভাল করতে পারেন বলে খ্যাতি। শুভাপুর এখান থেকে আট মাইল। সাইকেলে ঘণ্টা খানেক লাগে। কিন্তু আমি জানি পীর ফকিরে কিছু হবে না। বড় ডাক্তার যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া সার্ট মণ্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বৎসরে একবার, রোজার ঈদে।

রুনু আসলো একটু পরেই। আড়চোখে দু'তিন বার তাকালো রাবেয়ার দিকে। না, রাবেয়া সেই কুৎসিত কথাগুলি আর বলছে না। রুনু হাই তুললো। তার ঘুম পাচ্ছে। চোখ ফুলে উঠেছে। রাবেয়ার নোংরা কথা শুনে রুনুর কেমন লেগেছিল কে জানে। রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নবেম্বরে চোদ্দোয় পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগতো। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগতো। টগর ভাইয়ের বাসায় সন্ধ্যাবেলা অংক বুঝতে যেতাম। লিলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড় হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হোত আমার। লিলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগতো, কথা বেধে যেত মুখে। লিলু যখন আমার হাত ধরে টেনে বলতো, 'আসুন না দাদু ভাই লুডু খেলি।' তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠতো। গলার

কাছটায় ভার ভার লাগতো।

রুনুরও কি কোন ছেলেকে ভাল লাগে? রুনুও কি কখনো ভাবে বড় হয়ে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করবো? কে জানে। হয়তো ভাবে, হয়তো ভাবে না। রুনু বড় লক্ষী মেয়ে। এত লক্ষী আর এত কোমল যে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কেন জানিনা আমার মনে হয় এ ধরণের মেয়েরা সুখ পায়না জীবনে। আমি রুনুকে অনেক বড় করবো। রুনু ডাক্তার হবে বড় হলে। ষ্টেথোসকোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড় সুন্দর দেখায়। রুনু অংক ভালো পারেনা। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে এ্যালজেবরা বুঝাই। ডাক্তারী পড়তে অবশ্যি অংক লাগেনা।

সেদিন রুনুর অংক খাতা উল্টে চমকে গিয়েছিলাম। বেশ গোটা গোটা করে লেখা 'আমি ভালবাসি'। পরের কথা গুলি পড়ে অবশ্যি আমি লজ্জাই পেলাম। সেটি একটি ছেলেমানুষী কবিতা। আমি পৃথিবীর এই সৌন্দর্য ভালবাসি, গাছ-পালা-গান ভালবাসি এই জাতীয়। আমি বললাম,

সুন্দর কবিতা হয়েছে রুনু।

রুনু লজ্জায় গলদা চিংড়ির মত লাল হয়ে বললো, 'যাও ভারীতো। এটা মোটেই ভাল হয়নি।' আমি বললাম,

তাহলেতো মনে হয় অনেক কবিতা লিখেছিস।

উঁহু।

রুনু মাথা নীচু করে হাসতে লাগলো। আমি বললাম,

দেখা রুনু, লক্ষী মেয়ে তুই।

রুনু আরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক খুললো। তার যাবতীয় গোপন সম্পত্তি আমার ট্রাঙ্কে থাকে। এই বয়সে কত তুচ্ছ জিনিস অন্যের চোখের আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু

রুনুর নিজস্ব কোন বাক্স নেই। আমার ট্রাঙ্কের এক পাশে তার দুটি বড়বড় চারকোনা বিস্কিটের বাক্স থাকে। আর কিছু খাতা পত্রও থাকে দেখছি। রুনু হাতীর ছবি আঁকা একটা দু নম্বরী খাতা নিয়ে এসে লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেলো।

আমি বললাম,

তুই পড়ে শুনা আমাকে।

না তুমি পড়।

দে তাহলে আমার হাতে।

রুনু খাতাটা গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালালো। দেখলাম সব মিলিয়ে বারোখানা কবিতা। দুটি মায়ের উপর, একটি পলার উপর। (পলা আমাদের পোষা কুকুর। এক দুপুরে কোথায় যে চলে গেল!) একটি মন্টুর সাপ মারা উপলক্ষে—

'মন্টু ভাইতো মারলেন মস্ত বড় সাপ
চার হাত লম্বা সেটি কি তার প্রতাপ।'

মনে মনে ভাবলাম, রুনুকে একটি ভালো খাতা কিনে দেবো। রুনু খাতা ভর্তি করে ফেলবে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে বাচ্চা মেয়ের একটি চরিত্র আছে। মেয়েটি লিখতে শিখে অবদি ঘরের দেয়াল, বইয়ের পাতা, মার হিসেবের খাতায় যা মনে আসতো তাই লিখে বেড়াতো। মেয়েটির দাদা তাকে একটি চমৎকার খাতা দিয়েছিল। যা তার জীবনে পরম শখের সামগ্রী হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে টাকা ছিলনা। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। আমার মনে পড়ল হাতী মার্কা যে খাতাটায় রুনু কবিতা লিখেছে, রুনু সেটি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিল। যেখানে আমার নাম ছিল সেটি কেটে রুনু বড় বড় করে নিজের নাম লিখেছে। দিনে ক'ঘন্টা পড়ছি তার হিসেব রাখার জন্যে

খাতাটি কিনেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক যাবার পরও যখন কিছু লেখা হয়নি তখন একদিন রুনু সংকুচিত ভাবে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাপের মত একে বেঁকে বললো,

দাদা খাতাটা আমাকে দাওনা।

কোন খাতা ?

এইটে।

যা নিয়ে যা।

রুনু খাতা হাতে চলে গেল। তার মুখে সেদিন যে খুশীর আভা দেখেছি আমি আবার তা দেখবো। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য কাভারের চমৎকার একটি খাতা কিনে দেবো তাকে।

আমার হাতে যদিও টাকা ছিলনা তবু আমি রুনুকে খাতা কিনে দিয়েছিলাম। রুনুকে বড় ভালবাসি আমি। বড় ভালবাসি। রুনুকে দেখলেই আমার আদর করতে ইচ্ছে হয়। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। রুনুর ভাল নাম সালেহা। রুনু নামটা আমারই দেয়া। রুনুর জন্যে রুনু নামটাই মানান সই। রুনু নামে কেমন একটা বাজনার আমেজ আসে। আবার যখন দীর্ঘ স্বরে ডাকা হয় রু ... নু ... তখন কেমন একটা আমেজ আসে। রুনু বলল, 'দাদা আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

মা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছেন। বেশ মশা এখন। রাতের সঙ্গে সঙ্গে মশাও বাড়তে থাকবে। আমার কানের কাছে গুন গুন করবে তারা। পড়ায় মন দিতে পারছিনা; এম. এস-সিতে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমার। একটা ভদ্র ভালো বেতনের চাকরীর আমার বড় প্রয়োজন। রুনু গুটি শুটি মেরে রাবেয়ার পাশে শুয়ে পড়েছে। অবিশ্যি সে এখন ঘুমুবে না। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ রুনু ঘুমুতে পারে না।

আমার পাশেই রাবেয়া আর রুনু শুয়ে আছে। এত পাশে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রাবেয়াটা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক একবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে। সে কান্না বিলম্বিত দীর্ঘ সুরের কান্না। পলাও মাঝে মাঝে এমন কাঁদতো। মা বলতেন—'দুর! দুর!' কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন। গৃহস্তের বিপদ দেখলেই কুকুর বেড়াল এই জাতীয় পোষা জীবগুলি কাঁদে। রাবেয়ার কান্নার উৎস আমরা জানিনা। হয়তো সারা দিনের অবরুদ্ধ কান্না রাতে অঝোর ধারার মতই নেমে আসে। রাবেয়ার কান্নায় রুনু ভয় পায়। বলে, 'দাদা আপা কাঁদছে কেমন দেখো।'

আমি বলি, 'ভয় কি রুনু।' উচু গলায় ডাকি, 'এই এই রাবেয়া কাঁদে কেন। কি হয়েছে?'

কোন কোন রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। জানালা গলে নরোম আলো এসে পড়ে আমাদের গায়। জোছনায় নাকি হাস্নুহেনা খুব ভালো ফোটে। নেশা ধরানো ফুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমি ডাকি,

রুনু ঘুমিয়েছিস?

উহু।

গল্প শুনবি?

বল।

কি গল্প বলবো ভেবে পাই না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলি, 'এটা নয় আরেকটা বলি।' রুনু বলে, 'বল'। সে গল্পও শেষ হয় না। আচমকা মাঝ পথে থেমে গিয়ে বলি, 'তুই একটা গল্প বল রুনু।'

আমি বুঝি জানি?

যা জানিস তাই বল। বলনা।

উহু তুমি বল দাদা।

রুনুকে আমার টমাস হার্ডির এ পেয়ার অব ব্লু আইস এর গল্প বলতে ইচ্ছে হয়। আমার মনে হয় রুনুই যেন এ পেয়ার অব ব্লু আইসের নায়িকা। কিন্তু রুনু আমার ছোট বোন। সামনের নভেম্বরে সে চৌদ্দ বৎসরে পড়বে। এমন প্রেমের গল্প তাকে কি করে বলি। রুনু বলে,

থেমে গেলে কেন দাদা? শেষ করো না।

আমি গল্প বন্ধ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করি।

রুনু তোর কাকে সবচে ভাল লাগে?

তোমাকে।

হয়তো আমাকে তার সত্যিই ভাল লাগে। বাইরের তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ, মশারী উড়িয়ে নেবার মত বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।

এই আপা এই।

কি হয়েছে রুনু?

দাদা, আপা আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের হয়তো ভরা যৌবনের মেয়ে বলে। ভরা যৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন!

পাশের বাসার লোকজনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত যত বাড়ে আশে পাশের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়। দিনে কখনো থানার ঘড়ির ঘন্টা শুনিনা। রাত ন' টার পর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাশের বাসায় কে যেন কাশলো। কিছুক্ষণ পরই

খিল খিল করে হাসির-শব্দ শুনলাম। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই নাহার ভাবী। নাহার ভাবী খুব উঁচু গলায় কথা বলেন। 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে' নাহার ভাবী রেকর্ড চড়িয়েছেন। প্রায় রাতেই তিনি গান শোনেন। এই গানটি তার ফেবারিট। আমার রবীন্দ্র সংগীতের 'প্রাঙ্গনে মোর শিরিষ শাখায়' সবচে ভাল লাগে। এই রেকর্ডটি তারা খুব কম বাজান। 'বিধি ডাগর আঁখি' বড় করুণ। নাহার ভাবীতো খুব হাসি-খুশী। অথচ এমন একটি করুণ গান তাঁর পছন্দ কেন কে জানে। 'যারা খুব হাসি-খুশী করুণ সুর তাদের খুব মুগ্ধ করে—'কোথায় যেন পড়েছি। রুনু হঠাৎ ডাকলো,

দাদা ঘুমিয়েছো ?

না।

নাহার ভাবী গান বাজাচ্ছে।

হুঁ।

এর পর কোন গানটা বাজাবে জান ?

না, কোনটা ?

আধুনিক। 'জোনাকী ঝিকিমিকি জ্বালো আলো।'

সত্যি সত্যিই তাই বাজলো। রুনু শব্দ করে হাসলো।

আমি বললাম, 'তুই জানলি কি করে ?'

আমিইত আজ দুপুরে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার গান সবার শেষে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বললো, 'না না বললামতো যাবো না।' হারুন ভাই যদি সত্যি সত্যি রাবেয়াকে বিয়ে করে ফেলতো তবে আর মাঝ রাতে গান শোনা হতো না। রাবেয়ার গান ভাল লাগেনা। কে জানে কি তার ভালো লাগে। হারুন ভাইদের বাসার সবাই রাজী হলেও এ বিয়ে হতো না।

রাবেয়া যদি কোনদিন ভালো হয়ে ওঠে তবে তাকে খুব একজন হৃদয়বান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো। হারুন ভাইয়ের মতো একটি নিখুঁত ভালো ছেলে। সেও গভীর রাতে রেকর্ড বাজাবে। চাঁদের আলো এসে পড়বে তাদের দুজনার গায়। ভদ্রলোক রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন,

তোমার কপালে কিসের দাগ রাবেয়া?

পড়ে গিয়েছিলাম চৌকাঠে।

তিনি সেই কাটাদাগের উপর অনেক্ষণ হাত রাখবেন। তারপর চুমু খাবেন সেখানটায়। রুনু আমায় ডাকলো,

দাদা তোমার গান হচ্ছে।

আমি শুনলাম 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায় নিত্য হাসে কি উচ্ছ্বাসে।' আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠলো। গানটি আমার বড় ভালো লাগে।

গান শুনতে শুনতে আমি নাহার ভাবীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে খুব পরিচিত লোকদের মুখও আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। নাহার ভাবীর মুখটা ত্রিভুজ আকৃতির। হারুন ভাইদের বাসার সবার মুখ আবার লম্বাটে, ডিমের মতো। তারা সবাই ভারী সুন্দর। কয় পুরুষ ধনী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে কে জানে। ভাবতে ভালো লাগে এই পরিবারটিতে কোন দুঃখ নেই। মাসের পনেরো তারিখের পর থেকে খরচ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা এ পরিবারের মায়ের করতে হয়না। ইচ্ছে হলেই ইংরেজী ছবির মতো মোটরে করে এরা আউটিং-এ চলে যায়। স্বাধীনতা দিবসে এ পরিবারের মেয়েরা রাইফেল শুটিং-এ ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়।

তারা কবে এসেছিল শান্তি কটেজে আমার মনে নেই।

তবে খুব বৃষ্টি সেদিন। আমি, রাবেয়া আর রুনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জীপ থেকে ভিজতে ভিজতে নামলো সবাই। প্রথমেই রুনুর বয়সী একটি মেয়ে। নাম শীলা। বাবা আদর করে ডাকেন শীলু মা, মা শুধু বলেন, শীলু। তারপর বড়ো ভাই, চোখে বুড়ো মানুষের মত চশমা হলেও একেবারে ছেলেমানুষী চেহারা। গাড়ী থেকে নেমেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি চমৎকার বাড়ী শীলু।' বাবা নামলেন, মা নামলেন, চাকর-বাকর নামলো। আজীজ সাহেবদের চলে যাওয়ার অনেকদিন পর বাড়ীটা ভরলো। বর্ষা গিয়ে শীত আসলো। ব্যাডমিনটন কোর্ট কেটে হৈ হৈ করে দুই ভাইবোন লাভ ইলেভেন, লাভ টুয়েলভ করে খেলতে লাগলো।

রুনু বড় লাজুক। নয়তো সে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারতো। আমার খুব ইচ্ছে হোত শীলু মেয়েটির সঙ্গে রুনুর ভাব হোক। আমি দেখতাম সন্ধ্যা হলেই শীলু তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কবুতর উড়াতো। তাদের দুটি লোটন পায়রা ছিল। কারণে অকারণে যেত রাবেয়া। তাকে আমরা বাধা দিতাম না। বাধা পেলেই রাবেয়ার মেজাজ বিগড়ে যেত। চিটাগাং-এ বড় খালার ভাসুর মস্ত ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, 'যা ইচ্ছে হয় তাই করতে দেবেন একে। দেখবেন যা এবনরমালিটি আছে তা আপনি সেরে যাবে।' আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিলনা। নিখরচার চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। একদিন মা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার টেবিলে একটি কি যেন নামিয়ে রাখলেন। দেখি চমৎকার একটি কলমদান। ধবধবে সাদা দুটি পেঙ্গুইন পাখী কলমদানের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পেঙ্গুইন দুটোর মাঝা-

মাঝে একটি বাচ্চা পেঙ্গুইন মুখ হা করে শূন্যে তাকিয়ে। সেই হা করা মুখেই কলম রাখার জায়গা। আমার এ জাতীয় জিনিসের দাম সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু মনে হল এ অনেক দামী। মা কাঁপা গলায় বললেন,

রাবেয়া এনেছে ও বাড়ী থেকে।

আমার প্রথমেই যা মনে হলো তা হল রাবেয়া না বলেই এনেছে। কিন্তু রাবেয়া পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগলো, 'আমি আনিনি ওরা আপনি দিয়েছে।'

মিথ্যা রাবেয়া বলে না। কিন্তু ওরাইবা কেন দেবে? এমন একটা সৌখিন জিনিস হঠাৎ করে দিয়ে দিতে হলে যে দীর্ঘ-সূত্রতার পরিচয় প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে? খবরের কাগজে কলমদানিটি মুড়ে রুনু প্রথমবারের মত ওবাড়ী গেল। রাবেয়া নাকি সুরে বলতে লাগলো, 'আমার জিনিস রুনু যে বড়ো নিয়ে চললো, ভেঙ্গে ফেললে আমি মজা না দেখিয়ে ছাড়ব?'

জানা গেল রাবেয়া আনেনি ওরাই দিয়েছে। না, ঠিক ওরা নয়, হারুন বলে যে ছেলেটি শিগ্‌গীরই বিদেশ যাবে শুধু একটি পাশপোর্ট-এর অপেক্ষা—সে দিয়েছে। শীলু আর তার মাও ঠিক জানতেন না ব্যাপারটা। তারাও একটু অবাক হয়েছেন। শীলুর সঙ্গে এই অল্প সময়েই খুব ভাব হয়ে গেলো রুনুর। একটি লম্বাটে মিমি চকলেট আর বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' সে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম,

ওরা কেমন লোক রুনু?

খুব ভালো।

চকলেট পেয়ে গলে গেছিস না?

যাও! শীলু কিন্তু সত্যি ভাল। জান শীলু মোটর চালাতে পারে।

যাহ! এতটুকু বাচ্চা মেয়ে।

সত্যি। ওদের মোটর সারাতে দিয়েছে। যখন আসবে তখন সে দেখাবে চালিয়ে।

আর কি গল্প হোল?

কত গল্প, ওদের অনেক রেকর্ড আছে।

অনেক?

হুঁ হিসেব নেই এত। আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

শুধু তুই যাবি। ও আসবে না?

আসবে না কেন। নিশ্চয়ই আসবে।

শীলু অবশ্যি এসেছে কালে ভদ্রে। যখনি তার রুনুর সঙ্গে দরকার পড়তো তখনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকতো, 'রুনু, রুনু'। রুনু সব কাজ ফেলে ছুটে যেত। আমি মনে মনে চাইতাম মেয়েটা ঘন ঘন আসুক আমাদের কাছে। তার সাথে গল্প করার খুব ইচ্ছে হোত আমার। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম তার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে কি বলবো। দু'রাতে তাকে স্বপ্নেও দেখেছি।

একটি স্বপ্নে সে শাড়ী পরে এসে খুব পরিচিত ভঙ্গীতে বসেছে আমার টেবিলে। আমি বললাম, 'টেবিলে কেন শীলু চেয়ারে বসো।'

শীলু হাসতে হাসতে বললো, 'টেবিলে বসতেই যে আমার ভাল লাগে।' হাতে একটা চামচ নিয়ে টুং টাং করে চায়ের কাপে জল তরঙ্গের মতো একটা বাজনা বাজাতে লাগলো সে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছি দিনে দুপুরে। অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম শীলু আসলো। আগের মতই শাড়ী পরা। আমি বলছি,

শীলু এত দেরী কেন, কি চমৎকার গান হচ্ছিল।

আমার নামতো শীলা আপনি শীলু ডাকেন কেন ?

শীলুর সঙ্গে আমার কথা হোত এই ধরনের, হয়তো বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শীলু ডাকলো,

শুনুন, একটু রুনুকে ডেকে দেবেন।

বাবা পেঙ্গুইন পাখীর কলমদানি দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংকার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হোত না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন অন্যের সুখ সেই কারণেই সহজভাবে নেয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুল মাষ্টার। প্রাইভেট স্কুল। মাইনের ঠিক ছিল না। আমরা সব তার মাইনের উপর নির্ভর করে আছি দেখে মাষ্টারী ছেড়ে ঢুকলেন ফার্মে। বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ট হলেন। মাইনে সাড়ে তিনশ। কলমদানিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য বাবা পীড়া-পীড়ি করছিলেন। কিন্তু রুনু বা মা কেউ সে নিয়ে আর আগালো না। কলমদানির পেঙ্গুইন পাখীটি ধ্যানী মূর্তির মত বসে রইল আমার টেবিলে। রাবেয়া শুধু মাঝে মাঝে আমায় বলে, 'তোমার টেবিলে রেখেছি বলে এটা তোমার মনে করোনা খোকা। আচ্ছা, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কলম রেখো।'

ঘুমের ঘোরে রুনু বললো, 'না পানি খাবো না।' তারপর আরো খানিক্ষণ 'উহু' উহু" করলো। থানার ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা। সাড়ে বারো এক কিংবা দেড় যে কোনটা হতে পারে। আমার আরেকটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কে যেন বলেছিল সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল। তুমি একটা কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছ

তার আনন্দ। অনেকে আবার বলেন, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। এই মধ্য রাতে আমি একা জেগে আছি, নিঃসঙ্গত বটেই। সিগারেটের একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সিনেমায়। সমস্ত পর্দা অন্ধকার। আবছা আলো হলে দেখা গেল বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কে একজন। চার পাশে কেউ নেই ভুতুড়ে আবহাওয়া, থম থম করছে অন্ধকার। পর্দায় লেখা হলো 'সে কি নিঃসঙ্গ'? লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। পর্দায় লেখা হলো 'না নিঃসঙ্গ নয়, এইত তার সঙ্গী' চমৎকার বিজ্ঞাপন। আমার মনে হয় সিগারেটের নেশার মূল্যের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য বেশী।

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হলো। আমি কান পেতে রইলাম। কে হতে পারে? বাবা নিশ্চয়ই নন, তিনি ওঠেন সাড়াশব্দ করে, দরজা খোলেন ধুম-ধাম শব্দ করে। মন্টু অথবা মাষ্টার কাকা হবেন। টিউবওয়েলে পানি তোলার শব্দ হলো অনেকক্ষণ। ছড় ছড় করে পানি পড়ার আওয়াজ। কুলি করে পানি ছিটাতে ছিটাতে এদিকেই যেন কে আসছে। হ্যাঁ মাষ্টার কাকাই। তাঁর মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফুল গাছের কাছে চেয়ার পেতে গুন গুন করে গান গাওয়ার শখ আছে। পলা বেঁচে থাকলে প্রথমটায় অপরিচিত জন ভেবে ঘেউ ঘেউ করতো তারপর গরগর করে পরিচিত জনের অভ্যর্থনা। মাষ্টার কাকা বলতেন, 'কিরে পলু তোরও বুঝি ঘুম নেই?' আমি বললাম, 'কে?' মাষ্টার কাকা বললেন,

আমি, খোকা।

কি করেন?

এই বসেছি একটু; যা গরম। তুই ঘুমুসনি এখনো?

জী না।

আসবি নাকি বাইরে?

দরজা খুলে বেরুতেই চোখে পড়ল কাকা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। বললাম, 'চেয়ারে বসেন। চেয়ার নিয়ে আসি।'

না থাক।

আমি তাঁর পাশে বসলাম। গরম কোথায়? আশ্বিনের শেষাশেষি একটু শীতই করছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। মাষ্টার কাকারও বোধ করি মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। কাকা বললেন,

ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর আর হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসে না।

আমি বললাম,

প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গলে এরকম হয়।

কাকা অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। কাকা খুব নীচু গলায় বললেন,

কি মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস?

জ্বী, ভীষণ গন্ধ।

আমি যখন শিউলিতলা থাকতাম তখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কাঁঠাল-চাঁপার গাছ পড়তো, ভারী গন্ধ!

আমার কাকা কাঁঠাল-চাপার গন্ধ বাজে লাগে। বড় বেশী কড়া। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি। এখন প্রায় দুটো।

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম। খুব পরিষ্কার আকাশ। ঝক্ ঝক্ করছে তারা। কাকা বললেন,

দেখেছিস কত তারা? খুব যখন তারা উঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি।

আমার শীত করছে। তবু বেশ লাগছে বসে থাকতে। মাষ্টার কাকাকে খুব ভালো লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়ে টিয়ে করেননি। দুই যুগের বেশী আমাদের সঙ্গে আছেন। কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারেনা। বাইরের কেন আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি। তিনি যে বাবার বন্ধু এবং শুধু মাত্র বন্ধু হয়েও আমাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট ভাবে মিশে গেছেন তা আঁচ করতে কষ্ট হয় বই কি। বাবার সঙ্গে মাষ্টার কাকার পরিচয় হয় আনন্দমোহন কলেজে। অনেক দিন আগের কথা সে সব। মার কাছ থেকে শোনা। সরাসরিতো আর আমরা বাবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারতাম না। বাবা মাকে যা বলতেন মা তাই শুনাতেন আমাদের। মাষ্টার কাকাকে বাবা অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন বলেই হয়তো খুঁটিনাটি সমস্তই বলেছেন মাকে।

খুব চুপচাপ ধরনের ছেলে ছিলেন মাষ্টার কাকা। ক্লাসে জানালার পাশে একটি জায়গা বেছে নিয়ে সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। তেমন চোখে পড়ার মতো ছেলে নয়। একটু কুঁজো, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে রয়েছে, শুকনো দড়ি পাকানো চেহারা। ক্লাশের সবাই ডাকতো শকুনি মামা বলে। তবু বাবা তার প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমস্ত ব্যাপারে তার অদ্ভুত নির্লিপ্ততা আর অংকে অস্বাভাবিক দখল দেখে। তাদের ভেতর প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছিলো অতি অল্প সময়ে। মাষ্টার কাকা বলতেন, 'দুটি জিনিষ আমি ভালবাসি, প্রথমটি অংক দ্বিতীয়টি এষ্ট্রলজি।' সেই অল্প বয়সেই মাষ্টার কাকা নিখুঁত কুষ্টি তৈরী করতে শিখেছিলেন।

পরীক্ষার ঠিক আগে আগে মাষ্টার কাকাকে কলেজ ছেড়ে দিতে হলো। তিনি একটি বিশেষ ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় খুব কম মেয়েই সায়েন্স পড়তে আসতো আনন্দমোহনে। এডভোকেট রাধিকা-রঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে অনিলা চৌধুরী ছিলেন সব কটি মেয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম।

খুব আকর্ষনীয় চেহারা ছিল, খুব ভালো গাইতে পারতেন, ছাত্রী হিসেবেও অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেউ সেধে বলতে এলে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিতেন। হয়তো কিছুটা অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্যই ছেলেরা হঠাৎ করে অনিলা নাম পাল্টে শকুনি মামী বলে ডাকতে শুরু করলো। 'শকুন মামা ও শকুন মামী' এই নামে পদ্য লিখে বিলি করা হলো। মাষ্টার কাকা তাঁকে শকুন মামা ডাকায় কিছুই মনে করতেন না কিন্তু এই ব্যাপারটিতে হকচকিয়ে গেলেন। অসহ্য বোধ হওয়ায় অনিলা চৌধুরী আনন্দমোহন কলেজ ছেড়ে দেন। তার কিছুদিন পরই সপরিবারে তাঁরা কলকাতায় চলে যান স্থায়ী ভাবে। অনিলার প্রতি হয়তো মাষ্টার কাকার প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিলো। কারণ তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ছেড়ে দেন। এর পর আর বহুদিন তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রায় ছ'বছর পর বাবার সঙ্গে তার দেখা হলো কুমিল্লার ঠাকুর পাড়ায়, বাবার নিজের বিয়েতে। বাবা চিনতে পারেন নি। মাষ্টার কাকা বাবার হাত ধরে যখন বললেন, 'আমি শরীফ আকন্দ, চিনতে পারছোনা?' তখন চিনলেন। সময়ের আগেই বুড়িয়ে গেছেন। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, আরো কুঁজো হয়ে পড়েছেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন,

কি আশ্চর্য আবার দেখা হবে ভাবিনি। এখানে কোথায় থাকো তুমি?

তুমি যে বাড়ীতে বিয়ে করেছো আমি সে বাড়ীতেই থাকি। বাচ্চাদের পড়াই।

বাবা বললেন, 'আসবে আমার সঙ্গে?'

মাষ্টার কাকা খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজী হলেন। সেই থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। বাবা স্কুলের মাষ্টারী জোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর একার বেশ চলে যায় তাতে। তিনি জন্ম থেকেই আমাদের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা। ছোটবেলার কথা যা মনে পড়ে তা হলো মাদুর বিছিয়ে বসে বসে পড়ছি তাঁর ঘরে, রাবেয়াটা হৈ চৈ করছে, মাষ্টার কাকা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলছেন,

খোকা হাত মেলে ধর আমার সামনে। দু হাত।

কিছুক্ষণ গভীর মনযোগ দিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার অন্যমনস্কতা, বিড় বিড় করে কথা বলা। কান পাতলেই শোনা যায় বলছেন, 'সব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এর বাইরে কেউ যেতে পারবেনা। আমি না, খোকা তুইও না।' বাবার সঙ্গে বিশেষ কথা হতো না তাঁর। বাবা নিজে কম কথার মানুষ মাষ্টার কাকাও নির্লিপ্ত প্রকৃতির।

মাষ্টার কাকাকে বাইরে থেকে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর ভেতরে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন তিনি এষ্ট্রলজি নিয়ে খুব মেতেছেন। কাজ কর্মেও তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। গভীর রাতে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। খট খট শব্দ শুনে কতবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, কতবার মাকে আঁকড়ে ধরেছি ভয়ে। মা বলেছেন, 'ভয় কি খোকা, ভয় কি? ও তোর মাষ্টার কাকা।'

বাবা ভারী গম্ভীর গলায় ডাকতেন,

ও মাষ্টার, মাষ্টার, শরীফ মিয়া, ও শরীফ মিয়া।

খড়মের খট খট শব্দটা থেমে যেতো, মাষ্টার কাকা বলতেন,

কি হয়েছে ?

ছেলে ভয় পাচ্ছে, কি কর এত রাত্রে ?

তারা দেখছিলাম। এত তারা আগে আর উঠেনি। দেখবে ?

পাগোল। যাও ঘুমাও গিয়ে।

যাই।

মাষ্টার কাকা খড়ম খট খট করে চলে যেতেন।

আমাদের সবার পড়াশোনায় হাতে খড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। আমি তাঁর প্রথম ছাত্র, তারপর মন্টু। পড়াশোনায় মন নেই বলে রাবেয়ার তো পড়াই হলোনা। রুনু এখন পড়ে তাঁর কাছে। বাড়ীতে তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই তাঁর। থাকলেও যাবার উৎসাহ পান না। অবসর সময় কাটে এষ্ট্রলজীর বই পড়ে। অংকের মাষ্টার হিসেবে এষ্ট্রলজী হয়তো ভালই বোঝেন। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে বই এনে পড়ি আমি। বিশ্বাস হয়তো করিনা কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। তাদের জীবন চমৎকার অভিজ্ঞতার জীবন। প্রচুর সুখ, সম্পদ, বৈভব। বেশ লাগে ভাবতে। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ঐযে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছো না ? ওর ডান দিকের ছোট্ট তারাটি হোল কেতু। বড় মারাত্মক গ্রহ। আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।

জানিনা হয়তো জন্মলগ্নে কেতুর দশা থাকলেই আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। গভীর রাতে অনিদ্রাতপ্ত চোখে

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্য নিয়ন্তা গ্রহগুলি পরখ করতে হয়। কাকাকে আমার ভালো লাগে। তার ভিতরের প্রচণ্ড জানবার আগ্রহটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এষ্ট্রলজীর বই কিনে আনেন। দেশ বিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙ্গা মন্দির একটি, কোথায় বাদশা বাবরের আমলে তৈরী গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুল মাষ্টারের পড়াশোনার গণ্ডি আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে তত মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। কোনদিন মায়ের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে দেখিনি। খালি গায়ে ঘরোয়া ভাবে ঘরে বসে রয়েছেন এমনও নজরে আসেনি।

স্কুলে কাকা আমাদের ইতিহাস আর পাটীগণিত পড়াতেন। ইতিহাস আমার একটুও ভালো লাগতো না। নিজের নাম হুমায়ূন বলেই বাদশা হুমায়ুনের প্রতি আমার বাড়াবাড়ি রকমের দরদ ছিল। অথচ আমাদের ইতিহাস বইয়ে ফলাও করে শেরশাহের সঙ্গে তাঁর পরাজয়ের কথা লেখা। শেরশাহ আবার এমনি লোক যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড করিয়েছে, ঘোড়ার পিঠে ডাক চালু করিয়েছে কিন্তু এত করেও ক্লাস সেভেনের একটি বাচ্চা ছেলের মন জয় করতে পারেনি। পরীক্ষার খাতায় তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে আমার বড় রকমের গ্লানি বোধ হতো। সেই থেকেই সমস্ত ইতিহাসের ওপরই আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাকা তা জানতেন। একদিন আমায় বললেন, 'খোকা, তোর প্রিয় বাদশা হুমায়ুনের কথা বলবো তোকে, বিকেলে ঘরে আসিস।'

সেই দিনটি আমার খুব মনে আছে। কাকা আধশোয়া

হয়ে তাঁর বিছানায়, আমি পাশে বসে, রুনু আর মণ্টু সেই ঘরে বসে বসে লুডু খেলছে। কাকা বলে চলেছেন, 'হুমায়ুন সম্পর্কে কে একজন ছোট একটি বই লিখেছিলেন 'হুমায়ুন নামা'। বইটিতে হুমায়ুনকে তিনি বলেছেন দুর্ভাগ্যের অসহায় বাদশা। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যবান বাদশা হতে পারলে আমি বিশ্ববিজয়ী সিজার কিংবা মহাযোদ্ধা নেপোলীয়ানও হতে চাই না। যুদ্ধ বন্ধ রেখে চিতোরের রাণীর ডাকে তাঁর চিতোর অভিমুখে যাত্রা, ভিসতিওয়ালাকে সিংহাসনে বসানোর পিছনে কৃতজ্ঞতার অপরূপ প্রকাশ। গান, বই আর ধর্মের প্রতি কি আকর্ষণ!' আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যেখানে আযান শুনে হুমায়ুন লাইব্রেরী থেকে দ্রুত নেমে আসছেন নামাজে সামিল হতে, নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন, সে জায়গায় আমার চোখ ছল ছল করে উঠলো। কাকা বললেন, 'বড় হৃদয়বান বাদশা, সত্যিকার কবি হৃদয় তাঁর।' আমার মনে হলো আমিই যেন সেই বাদশা। আর আমাকে বাদশা বানানোর কৃতিত্বটা কাকার একার।

আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি, কাকা বসে আছেন ঠাণ্ডা মেঝেতে অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারিদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরনো কথা মনে পড়লো। আমি ডাকলাম,

কাকা, কাকা।

কি?

অনেক রাত হয়েছে ঘুমুতে যান।

যাই।

কাকা মন্থর পায়ে চলে গেলেন। আমি এসে শুয়ে পড়লাম।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

রাবেয়া ঘুমের মধ্যেই চেঁচাল, 'আম্মি আম্মি।'

আমার মনে পড়ল রাবেয়া একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাস। দারুন গরম। কলেজ থেকে এসে শুনি রাবেয়া নেই। তার যাবার জায়গা সীমিত। অল্প কয়েকটি ঘর বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায় সে। দুপুরের খাবারের আগে আসে। খেয়ে দেয়ে অল্প কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়া। সেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে রাবেয়া আসেনি। মার কান্না প্রায় বিলাপে পোঁছেছে। মন্টু দুপুর থেকেই খুঁজছে। বাবা হতবুদ্ধি। একটি অপ্রকৃতিস্থ সুন্দরী যুবতী মেয়ের হারিয়ে যাওয়াটা অনেক কারণেই বেদনাদায়ক। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রুনু চুপচাপ শুয়ে আছে তার বিছানায়। তার দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিটা বড় নীরব। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা রুনুর ছোট্ট শরীরটা একটা অসহায়তারই প্রতীক। আমায় দেখে রুনু উঠে বসলো। বললো,

কি হবে দাদা?

তার চোখের কোণে চব্বিশ ঘণ্টাতেই কালি পড়েছে। আমি বললাম, 'পাওয়া যাবে রুনু, ভয় কি?'

কিন্তু ওযে ঠিকানা জানে না। কেউ যদি ওকে খুঁজে পায় ওকি কিছু বলতে পারবে?

সে কিছুই বলতে পারবে না। তার বড় বড় চোখে সে হয়তো অসহায়ের মত তাকাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট খুকীর মত শুধুই বলবে, 'আমি বাড়ী যাব। আমি বাড়ী যাব।' সে বাড়ী যে কোথায় তা তার জানা নেই। রুনু আবার বললো,

দাদা ও যদি কোন বাজে লোকের হাতে পড়ে?

রুনু বুঝতে শিখেছে। মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়

ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামী দেখতে পায়। সে নোংরামীর বড় শিকার তারাই তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

রাবেয়া ফিরে এলো রাত আটটায়। সঙ্গে মাষ্টার কাকা। বুকের উপর চেপে বসা দুশ্চিন্তা নিমিষেই দূর হলো। মাষ্টার কাকা বললেন, 'ওকে আমি স্কুলের কাছে পাই, হারিয়ে গেছে তা আমি জানতাম না।' এসব শোনবার উৎসাহ আমার ছিল না। পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। স্কুল ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। মাষ্টার কাকাকে দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হলো, আরেকটু হলেই গাড়ী চাপা পড়ত—এসবে এখন আর আমাদের উৎসাহ নেই। বাবা পর পর দুদিন রোজা রাখলেন। তিনি রোজা মানত করেছিলেন।

খোকা ও খোকা।

কি ?

বাতি জ্বালো।

কেন ?

আমার বাথরুম পেয়েছে।

রাবেয়া মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমি বললাম, 'বাতি জ্বালতে হবে না আয় বারান্দায় আলো আছে।'

না জ্বালো।

দেশলাই খুঁজে হারিকেন জ্বালালাম। দরজা খুলতেই ও ঘর থেকে মা বললে, 'কে ?' শেষ রাতের দিকে মায়ের ঘুম পাতলা হয়ে আসে।

আমরা মা, রাবেয়া বাথরুমে যাবে।

বারান্দায় এসে রাবেয়া হাই তুললো। বড় বড় নিঃশ্বাস

নিয়ে বললো,

কি চনমনে গন্ধ ফুলের, না ?

হু ঁ। ফুলের গন্ধ তোর ভাল লাগে রাবেয়া ?

না বাজে।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললো,

পলা কবে আসবে খোকা ?

পলার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মাঝে মাঝেই পলার কথা জানতে চায়। কে জানে কুকুরটা যে কিসের দুঃখে বিবাগী হলো।

আজ রাতেও এক ফোটা ঘুম হবে না। দু'মাস পরেই পরীক্ষা, এক রাত্রি ঘুম না হলে পর পর দুদিন পড়া হয় না। বুঝতে পারছি কোন ফাঁকে মশা ঢুকেছে কয়েকটা। কেবলি গুন গুন করছে কানের কাছে। কান অথবা মুখের নরোম মাংস থেকে এক ঢোক করে রক্ত না খাওয়া পর্যন্ত এ চলতেই থাকবে। পাখা করে মশা তাড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে না। বালিশে মাথা গুজে ঘুমের জন্যে প্রাণপনে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।

হঠাৎ করেই অনেকটা আলো এসে পড়লো ঘরে। শিলুদের বারান্দার একশ ওয়াটের বালবটা জ্বালিয়েছে কেউ। কে হতে পারে ? শিলুর বাবা না নাহার ভাবী ? শীলু কিংবা তার মাও হতে পারে। শীলুর মা চমৎকার মহিলা। একবার এসেছিলেন আমাদের ঘরে।

শীলুর মা যিনি সন্ধ্যায় লনে বসে শীলুর বাবার সঙ্গে হেসে হেসে চা খান, বিকেলে প্রায়ই হারুণ ভাইএর পার্টনার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাডমিনটন খেলেন, যার একটি গাঢ় সবুজ শাড়ী আছে, যেটি পরলে তাঁর বয়স দশ বৎসর কম মনে হয়,

তিনি একদিন এসেছিলেন আমাদের বাসায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। রুনুর স্কুল বন্ধ ছিল, বাবা ছিলেন অফিসে। শীলুর মা লাল বুটি দেয়া হালকা নীল শাড়ী পরেছিলেন। সোনালী ফ্রেমের চশমায় তাকে কলেজের মেয়ে প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছিল। আমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কি করে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আর শিলুর মা? তিনি মূর্তির মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলেছিলেন,

হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়।

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। তিনি বলে চললেন, 'আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না আমার ওখানে। কি করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে। মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছিঃ!'

মা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন।

রাবেয়া অকারণে মার খেলো সেদিন। সব শুনে বাবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। কেন সে যাবে হ্যাংলার মতো? রাগলে বাবার মাথার ঠিক থাকেনা। বয়স্কা আধপাগল একটা মেয়েকে তিনি উন্মাদের মতই মারলেন। রাবেয়া শুধু বলছিলো,

আমি আর করবো না। মারছো কেন? বললামতো আর করবো না।

কি জন্যে মার খাচ্ছিল তা সে নিশ্চয়ই বুঝছিলো না। বার বার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। মা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আর আশ্চর্য, কান্না শুনে প্রথম বারের মত হারুন ভাই আসলেন আমাদের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অল্প অল্প

কাঁপছিলেন।

তাঁর চোখ লাল। তিনি থেমে থেমে বললেন,

ওকে মারছেন কেন?

বাবা তাকালেন হারুন ভাই-এর দিকে। আমিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর আমাদের এখানে আসা আমাদের ঠাট্টা করার মতই মনে হলো। রাবেয়া বললো,

দেখুন না আমাকে মারছে শুধু শুধু।

হারুন ভাই-এর ফ্যাকাসে মুখে আমি স্পষ্ট গভীর বেদনার ছায়া দেখেছিলাম। তবু কঠিন গলায় বললাম,

আপনি বাসায় যান। আপনি এসেছেন কেন?

শীলুদের বাসার জানালায় শীলু আর তার মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাবেয়াকে ক'দিন চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হলো। তার দরকার ছিলো না, হারুন ভাই-এর বিয়ে হলো নাহার ভাবীর সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকনমিক্সে বি. এ. পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানী চলে গেলেন কেমিকেল ইনজিনীয়ারিংএ ডিগ্রী নিতে। আগেই সব ঠিক হয়েছিল।

নাহার ভাবী সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাত দিন না পেরুতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। রাবেয়াকে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায়। রাবেয়া হাতে হলুদ রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরলো।

মা ছাখো ঐ মেয়েটি আমায় কি সুন্দর একটা শাড়ী দিয়েছে। আমি চাইনি ও আপনি দিলে।

রাবেয়া নীল রঙের একটা শাড়ী আমাদের সামনে মেলে ধরলো। চমৎকার রং। অদ্ভুত সুন্দর।

কাক ডাকলো। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আযান হলো। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের জমাট বাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবী খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গেতো তার! আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন অল্প, বললেন, 'আজ দেখি খুব ভোরে উঠেছেন।'

আমি চুপ করে রইলাম, হাঁ বাচক মাথা নাড়লাম একটু।

নাহার ভাবী বললেন,

রাতে আপনার গান বাজিয়েছিলাম। শুনেছেন?

জ্বী শুনেছি।

রুনুর পছন্দ করা গান। সেই সাজিয়ে দিয়েছিল। রুনু ঘুমুচ্ছে এখনো?

জ্বী।

ডেকে দিন একটু, খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের উপর। চোখ ভালো থাকে।

রুনু রাবেয়ার গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমি ডাকলাম, 'রুনু রুনু।'

কদিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড় ধরনের কোন রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে তেমনি। বয়স হয়েছে, ভাঙ্গা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, দেহ মন শ্রান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগেনা। খুব শীগ্‌গিরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাবো। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী দেখতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাবো। কলেজে যখন পড়ি তখন ক'বন্ধুকে

নিয়ে একবার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর, এত আশ্চর্য। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নীচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠবো। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে উঠতে পারলে সূর্যাস্ত দেখা যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার নেবো, অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাবো।

খোকা ও খোকা।

কি মা ?

কিছু না, গল্প করি তোর সাথে, আয়।

বসেন, সারাদিন তো কাজ নিয়েই থাকেন।

কই আর কাজ।

আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে গেছে মা।

আর স্বাস্থ্য !

মা বসলেন আমার সামনে। তাঁর চোখের কোণে গাঢ় কালি পড়েছে। তিনি থেমে থেমে বললেন,

কাল রাতেও আমার ঘুম হয়নি খোকা।

আমায় ডাকলেন না কেন, ওষুধ ছিলো তো আমার কাছে।

দুবার ডেকেছি, তুই ঘুমুচ্ছিলি।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আমার খুব ঘুম বেড়েছে দেখছি। রাত নটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি, উঠি পরদিন আটটায়। মা বললেন,

রাবেয়াকে নিয়ে তোর বড় খালার কাছে একবার যাবো।

হঠাৎ কি ব্যাপার ?

এমনি ঘুরে আসি একটু।

কোন পীরের খোঁজ পেয়েছেন বুঝি ?

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আমি দেখলাম মার

নাকের পাতলা চামড়া তির তির করে কাঁপছে। মাকে আমার হঠাৎ খুব ছেলেমানুষ মনে হলো। বললাম,

রাত দিন কি এতো ভাবেন?

কই কিছু ভাবি না তো। চা খাবি এক কাপ?

এই দুপুরে?

খা না। আগেতো খুব চা চাইতি।

মা উঠে চলে গেলেন। মার ভিতর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শরীর সুস্থ নয় নিশ্চয়। মাকে একজন বড় ডাক্তার দেখালে হতো।

রুনুর স্কুল ছুটি হয় সাড়ে চারটায়। আজ সে দুপুরেই হাযির। হাসতে হাসতে বললো,

স্কুল ছুটি হয়ে গেলো দাদা।

সকাল সকাল যে? কি ব্যাপার?

মর্নিং স্কুল আজ থেকে। সকাল সাতটায় স্কুলে গেলাম। তুমিতো তখন ঘুমে। বাব্বাহ্ এত ঘুমুতেও পারো!

মা চা নিয়ে ঢুকলেন। রুনু বললো,

আমায় এক কাপ দাওনা মা।

আরেকটা কাপ এনে ভাগ করে নে।

না তা হলে থাক। দাদা খাক।

আহা নে না।

রুনু চা নিয়ে বসলো একপাশে। চুমুক দিতে দিতে কি ভেবে হাসলো খানিকক্ষণ। বললো,

মা ক্ষিধে পেয়েছে, কি রান্না মা আজকে?

মাছ। ক্ষিধে নিয়ে চা খেতে আছে?

ওতে কিছু হবেনা মা। আচ্ছা আপাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছে। কোথায়?

কি জানি কোথায়। তোর আম কাঁঠালের বন্ধ কবে রুনু ?

দেরী আছে, সামনের মাসের পনেরো তারিখ থেকে।

আমি তোর খালার বাসায় যাবো বেড়াতে। তুই তাহলে থাকবি ?

সে কি, তোমার সংগে কে কে যাবে মা ?

আমি, রাবেয়া আর তোর আব্বা।

বেশতো। আমি বুঝি বাতিল ?

রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

দাদা তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে ?

নিশ্চয়ই।

আমি কিন্তু কক্সবাজার যাবো। শীলুরা গিয়েছিলো গতবার।

বেশতো।

আর যে দিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন···

সেদিন কি রুনু ?

সেদিন আমাকে দশটা টাকা দিতে হবে। দেবে তো ?

হ্যাঁ, কি করবি ?

এখন বলবো না।

রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াল। সেকি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফি কাটা মসৃণ চিবুকে রূপের বন্যা নামছে। যৌবনের সেই লুকানো চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে। সে দেখছি প্রায় রাতেই শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ে। পড়তে পড়তে এক একবার চোখে রুমাল দিয়ে কেঁদে

উঠে। আমি বলি,

কি হয়েছে রুনু?

কই কিছুতো হয়নি।

কাঁদছিস কেন?

কাঁদছি নাতো।

কি বই পড়ছিলি দেখি?

কেন বেড়াতে গেলো ?

দারোয়ান হাসতো কথা শুনে। আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতো,

আবার আসবে আপামনি।

কবে আসবে ? কাল ?

ষোল তারিখ আসবে।

না৷ কালকেই আসতে হবে। তুমি ওদের আনতে যাবে ইস্টিশনে ?

জ্বী আপামনি।

আমিও সঙ্গে যাবো।

কতদিন পর দেখলাম শীলুকে।

গাড়ী থেকে নামতেই আমার সঙ্গে দেখা। খুব কোমল কণ্ঠে বললো,

আপনারা সব ভাল ছিলেন তো? রুনু ভালো?

তেমনি লম্বাটে মুখ, কপালের দিকে টানা ভুরু, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে অন্য দিকে তাকানো। আমার হৃদপিণ্ড দুলে উঠলো, শীলুর চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে গিয়ে অদ্ভুত কষ্ট হলো। আমি বললাম,

তোমরা ভালতো শীলু?

জ্বী!

শীলুর মা মালপত্র নামাতে নামাতে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। বুড়ো বয়সেও ঠোঁটে আর মুখে রং মেখেছেন। বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়ীতে তাঁকে হাস্যকর লাগছিলো, কিন্তু তবু তিনি শীলুর মা, আমি বিনীত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

সবার শেষে নামলেন নাহার ভাবী। ভারী সুন্দর হয়েছেন তিনি। গায়ের মসৃন চামড়া ঝক্‌ঝক্ করছে। নাকের উপর জমে থাকা বিন্দুবিন্দু ঘাম চিক্ চিক্ করছে রোদ লেগে। নাহার ভাবী আমাকে দেখে ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন,

আপনাদের কথা যা ভেবেছি।

আমিও ভেবেছি, আপনারা কবে বা আসবেন।

রুনু আর রাবেয়া কোথায়?

রুনু স্কুলে। রাবেয়া বেড়াতে বের হয়েছে।

রুনুর জন্যে আমি অনেক গল্পের বই এনেছি। অনেক নতুন রেকর্ড কিনেছি।

শীলুর মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

রোদে তোমাদের মাথা ধরবে, ভেতরে গিয়ে বস মেয়েরা।

শীলু তোমাকে আমি গোপনে করুণা বলে ডাকি। তোমার জন্যে আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। প্রতি রাতে তোমাকে নিয়ে কত কি ভাবি। যেন তোমার কঠিন অসুখ করেছে। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছ মৃত্যুর। হঠাৎ একদিন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার বিছানার পাশে। তুমি ছেলে মানুষের মতো বললে,

এত দিন পর এলেন ?

আমি বললাম, 'তুমিতো আমায় কখনো ডাকনি শীলু। ডাকলেই আসতাম।' তুমি বিবর্ণ ঠোঁটে হাসলে। আমি বসলাম তোমার পাশে। জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে তোমার লালচে চুল। আমি তোমার মাথায় হাত রাখলাম। তুমি বললে, 'জানেন আমার যে একটি ময়না ছিলো। সেটি ঠিক মানুষের মত শিষ দিত, সেটি খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়েছে।'

কি হাস্যকর ছেলেমানুষি ভাবনা। কতদিন ভাবতে ভাবতে রাত হয়ে যেতো। রাস্তায় নিশি পাওয়া কুকুর চেঁচাতো। ঘুম ভেঙ্গে মাষ্টার কাকা উঠে আপন মনে কথা বলতেন।

আমার বন্ধু রমিজ এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিলো। মেয়েটি তার স্বামী ও দুটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো রমিজের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার স্বামী দুঃখে লজ্জায় এনড্রিন খেয়ে মরেছিলেন। ঘটনাটি শুনে রমিজের

প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল। এর অনেকদিন পর যখন শীলুরা ঘর অন্ধকার করে বাইরে বেড়াতে গেলো তখন কেন যেন মনে হলো রমিজ হয়তো কোন দোষ করেনি।

ভালবাসার উৎস কি আমি জানি না। আশফাক বলতো ভালবাসা হচ্ছে নিছক কামনা, যৌন আকর্ষণের ভদ্র পরিভাষা। কিন্তু আমার তা মনে হয়না। আমার গলা জড়িয়ে শীলু কখনো ঘুমিয়ে থাকবে এ ধরনের কল্পনাতো কখনো মনে আসেনা।

একদিন শীলুর বয়স হবে। পাক ধরবে তার চুলে, পোকায় কাটা অশক্ত দাঁতে কালো ছোপ পড়বে, ছানি পড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে তখন কি সে দেখতে পারবে বছর ত্রিশেক আগে একটি অনুভূতি প্রবণ তরুণ ছেলে কান পেতে আছে কখন সেই কোমল কণ্ঠ শুনা যাবে,

দাদু ভাই, রুনু বাসায় আছে ?

আমি ইদানিং কেমন আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেছি। মা আমাকে মাঝে মাঝে বুঝতে চেষ্টা করেন। রুনু প্রায়ই অনেক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আমার বোঝার ভুল। তবু তার হাবভাব যেন কেমন। যেন কিছু জানতে চেষ্টা করছে। সেদিন অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে বসলো,

শীলুকে কি তোমার খুব বুদ্ধিমান মনে হয় দাদা ভাই ?

আমি নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে বললাম,

হ্যাঁ।

তোমার কাছে ওকে খুব ভাল লাগে ?

তা লাগে।

কিন্তু ও কি বলে জান?

কি বলে?

বলে তোমার দাদাভাইকে দেখলেই মনে হয় বোকা, তাইনা?

বলাবাহুল্য আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাকে কেউ বোকা বলেছে সে জন্যে নয়। আমার গভীর আবেগের কথা সে জানছেনা এই জন্যে। আমার ধারণা, শীলু যখন সমস্ত কিছু জানবে তখন নিশ্চয়ই আমাকে অন্য চোখে দেখবে। আমি বললাম,

শুনে তোর খুব খারাপ লেগেছে রুনু?

হ্যাঁ।

শিলু কি তোর খুব ভাল বন্ধু?

হ্যাঁ ভাল বন্ধু।

আমাদের সংসারে কি একটা পরিবর্তন এসেছে। সুর কেটে গেছে কোথায়। শীলু আমার সমস্ত চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমি ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা। মা ভীষণ রকম নীরব হয়ে পড়েছেন। শংকিতভাবে চলাফেরা করছেন। তাঁর হতাশ ভাব ভঙ্গি, নীচু স্বরে টেনে টেনে কথা বলা সমস্তই বলে দেয় কিছু একটা হয়েছে। বাবা এসে প্রায়ই আমার ঘরে বসেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দু' একটি কথা বার্তা বলেন।

কেমন পড়াশুনা চলছে। বাজারে জিনিষপত্রের যা দাম।

আমি তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি তিনি কিছু একটা বলতে চান। এলোমেলো কথা বলতে বলতে এটি সেটি নাড়তে থাকেন তারপর হঠাৎ করেই উঠে চলে যান। কি বলতে চান, তা বুঝে উঠতে পারিনা। বাবাকে আমরা বড়

ভয় পাই, নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনা। মাকে যখন জিজ্ঞেস করি, 'কি হয়েছে মা?'

মা অবাক হবার ভাণ করে বলেন,

হবে আবার কিরে খোকা?

মা মিথ্যা বলতে পারেন না, কিছু লুকুতে পারেন না। আমি জোর দিয়ে বলি, 'বলো কি হয়েছে?'

মা মেঝের দিকে তাকিয়ে টানা সুরে কাঁপা গলায় বলেন,

কোথায় কি হয়েছে?

অথচ প্রায়ই দেখছি বাবা আর মা ফিস্ ফিস্ করে আলাপ করছেন। বিরক্তিতে বাবার ভ্রু কুচকে উঠছে ঘন ঘন। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকছেন। পরশু রাতে মা গুন গুন করে কাঁদছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে গান গাইছে। রাবেয়া বললো,

ও খোকা ও ঘরে মা কাঁদছেরে।

রুনু বললো, 'সত্যি দাদা মা কাঁদছে, আমি ভেবেছি বুঝি বেড়াল।'

রাবেয়া গলা উঁচু করে ডাকলো,

মা, ও মা, কাঁদছো কেন?

মা চুপ করে গেলেন। রাবেয়া আবার ডাকলো,

মা ও মা।

মা ধরা গলায় বললেন, 'কি?'

তুমি কাঁদছিলে কেন?

আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালবাসি। যে সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন সেখানে আমার যা ভূমিকা আমি তারচে অনেক বেশী করতে চাই। যদি কোন জটিলতা এসেই থাকে তবে সে জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাইনা।

আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনু শীলুর মতো একটি ময়না এনে পুষুক যেটি সময় অসময়ে মানুষের মতো সুখের শীষ দিয়ে উঠবে।

তুপুর বেলা ঘুমিয়ে আছি হঠাৎ রাবেয়া আমায় ডেকে তুললো। উত্তেজনায় তার চোখের পাতা তির তির করে কাঁপছে।

ও খোকা শুন্‌ছো আমার বিয়ে।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। রাবেয়া খিল খিল করে হেসে বললো,

বিশ্বাস হচ্ছেনা? আল্লার কসম, সত্যি বিয়ে, আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

কখন বিয়ে ?

আজ বিকেলে। এখন আমি গোসল করে সাজবো। তুমি আবার সবাইকে বলে বেড়িওনা খোকা। আমার বুঝি লজ্জা নেই ?

মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা বললেন,

বর পক্ষের ওরা বিকেলে দেখতে আসবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম,

পাগোল মেয়েকে বিয়ে করবে কে ?

মা বললেন,

পাগোল কোথায়রে, ঐ একটু যা আছে তা সেরে যাবে।

বর পক্ষের লোকজন জানে ?

মা ভীত কণ্ঠে বললেন,

আমি ঠিক বলতে পারিনা তোর আব্বা বলেছেন কি না। তুই আপত্তি করিসনা খোকা।

কিন্তু হঠাৎ বিয়ের কি হলো ?

আমি জানিনা। তোর আব্বা সব ঠিক করেছেন। তোর আব্বাকে জিজ্ঞেস কর।

দেখতে আসবে পাঁচটায়, চারটার ভেতরেই সব তৈরী হয়ে গেলো। মা ঘামতে ঘামতে খাবার করলেন। বসবার ঘরে নতুন পর্দা লাগানো হল। ট্রাঙ্কে তোলা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দেয়া হল টেবিলে। মন্টু সাইকেলে করে দূর কোথা থেকে ফুল এনে ফুলদানী সাজালো। রুনু রাবেয়ার একটি শাপলা রঙ্গের শাড়ী পরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। রাবেয়া ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো,

মা, রুনু যে বড় আমার শাড়ী পরেছে, ময়লা করে ফেলবে তো।

ময়লা হলে ইস্ত্রী করিয়ে দেব।

যদি ছিড়ে ফেলে?

কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস।

হুঁ আমি তো ভ্যাজর ভ্যাজর করছি। আমার যদি আজ বিয়ে না হোত দেখতে রুনুর চুল ছিড়ে ফেলতাম না!

রাবেয়া পরেছে একটি বেশ দামী আসমানী রঙ্গের শাড়ী। সাধারণ সাজ-গোজের বেশী কিছু করেনি, এতেই তাকে যে এত সুন্দরী লাগবে কে ভেবেছে। বড় বড় ভাসা চোখ, বরফি কাটা চিবুক, শিশুর মত চাউনি। সব মিলিয়ে রূপকথার বই-এ আঁকা বন্দী রাজকন্যার ছবি যেন।

মাষ্টার কাকা একটা ফর্সা পাঞ্জাবী পরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন, বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্যে। পাঁচটায় তাদের আসবার কথা ছ' টা পর্যন্ত কেউ এলোনা। ঠিকানা নিয়ে মাষ্টার কাকা খুঁজতে গেলেন। জানা গেল কেউ আসবেনা। একটি পাগোল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র তারা কি করে যেন

জেনেছে।

লজ্জায় আমার চোখে পানি এসে পড়লো। কি দরকার ছিলো এ সবের। নাই হোত বিয়ে। মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,

দরকার ছিলো রে।

কি জন্যে ?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় খোকা।

কি সন্দেহ ?

কাল তোর বাবা রাবেয়াকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে, তখন জানবি।

বাবা নামলেন রিক্শা থেকে। রাবেয়া ধীরে সুস্থে নামলো। মুখ কালো করে বললো,

মা ডাক্তার আমাকে বেশী পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন শুধু বিশ্রাম। তাই না বাবা ?

বাবা মার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন,

এখন কি করবে ?

ব্যাপারটা আমি জানলাম, রুনু জানলো, মন্টু ফুটবল খেলতে বাইরে গেছে শুধু সেই জানলো না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানোর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোট বেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াতো চারদিকে। সব বাড়ী ঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশে পাশের মানুষদের। তাদের ভিতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কি লাগে ? মার রাত্রে ঘুম হয়না। তার চোখের নীচে গাঢ়

হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায়না। নাহার ভাবী বেড়াতে এসে বললেন,

কি ব্যাপার তোমরা কেউ দেখি আমাদের ওখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।

রুনু কথা বলে না। মা নীচু গলায় বলেন,

রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।

কি অসুখ, কই জানি না তো?

এমনি শরীর খারাপ।

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেঁধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাষ্টার কাকার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া, তখনই আমি কথা শুরু করি।

রাবেয়া।

কি?

কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই?

কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।

খুব ভালো লাগে?

হুঁ।

কাকে কাকে ভালো লাগে?

সবাইকে।

ছেলেদের ভালো লাগে?

হুঁ।

নাম বল তাদের।

এক টানা নাম বলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহ-ভাজন মনে হয় না আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে।

রাবেয়াকে বড় আপা ডাকে।

তারা তোকে আদর করে রাবেয়া?

হুঁ।

কি করে আদর করে?

আমার সঙ্গে খেলে; আর···

আর কি?

গল্প করে।

কিসের গল্প?

ভূতের।

ইতস্ততঃ করে বলি,

তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া?

যাহ! তাই বুঝি খায়?

মার কথাগুলি হয় আরো স্পষ্ট, আরো খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন,

রাবেয়া কে তোর শাড়ী খুলেছিলো? বলতো নাম।

যাও মা, তুমি তো ভারী।

মা রেগে যান। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন,

তাহলে এমন হলো কেন? বল তুই হারামজাদী?

রাবেয়া বলেনা কিছু, মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড় বড় চোখে তাকায়। বলে, 'কাঁদো কেন মা?'

বল কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি?

রাবেয়া চুপ করে থাকে। কথাই হয়তো বুঝতে পারেনা। বাবা পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। মেজাজ হয়েছে খিট খিটে। অল্পতেই রেগে বাড়ী মাথায় তুলেন। রুনু স্কুল থেকে ফিরতে দেরী করেছে বলে মার খেলো সেদিন। একদিন দেখি বাবা এক গণক নিয়ে এসেছেন, পাড়ার সব যুবকদের নাম লিখে কি

সব মন্ত্র পড়ছে সে।

রাবেয়ার অসুখের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরা পড়ল একদিন ভোরে। চা খেয়েই ওয়াক ওয়াক করে বমি করলো সে। যদিও তার শারীরীক অস্বাভাবিকতা নজরে আসার সময় এখনো হয়নি তবু তার শরীরে আলগা শ্রী আসছিলো। একটু চাপা গাল ভরাট হয়ে উঠছে, ভুরু মনে হচ্ছে আরো কালো, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল, চলাফেরায় এসেছে এক স্বাভাবিক মন্থরতা। স্কুলের হেড মাষ্টারের বউ একদিন বেড়াতে এসে বললেন,

দেখো ও বউ, তোমার মেয়ে কেমন হাঁটছে, ঠিক যেন পোয়াতী।

কথাগুলি আমার বুকে ধ্বক করে বিঁধেছে। কিছু একটা করতে হবে এবং খুব শিগ্‌গীরই। সবার জানবার ও বুঝবার আগে। একটি করে দিন যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। কিন্তু কি করা যায়? বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন। একবার ইচ্ছে হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বাবাকে বড় ভয় করি আমরা।

সেদিন রাতে শুনলাম বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, 'বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো মেয়েকে।' মা বললেন, 'ছিঃ ছিঃ বাপ হয়ে এই বললে?' বাবা বিড় বিড় করে বললেন, 'আমার মাথার ঠিক নেই শানু, তুমি কিছু মনে করোনা। পাগল মেয়ে আমার!' বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনলাম। অনেক রাত অবধি ঘুম হলোনা আমার। এক সময় রাবেয়া ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো। কাতর গলায় বললো,

খোকা।

কি? বাথরুমে যাবি?

উহু`।

কি হয়েছে? খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ।

বমি করবি?

না।

স্বপ্ন দেখেছিস?

হুঁ।

কি স্বপ্ন?

মনে নেই।

ঘুমিয়ে পড়, ভালো লাগবে।

আচ্ছা।

রাবেয়া শুয়ে পড়লো আবার। মুহূর্তেই উঠে বসে বললো, খোকা।

কি?

পলা এসেছে।

কে এসেছে?

পলা, দোর খুলে ছ্যাখ। বারান্দায় বসে আছে। আমি ডাক শুনলাম।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসলাম দু'জনেই। কোথায় কি? খা খা করছে চারিদিক। রাবেয়া ডাকলো, 'পলা, পলা।'

মা বললেন, 'কে কথা বলে?'

আমি রাবেয়া, মা।

বাবা ধমকে উঠলেন, 'যাও যাও ঘুমুতে যাও। কি কর এত রাত্রে?'

শব্দ শুনে মাষ্টার কাকা বাইরে আসেন।

কি হয়েছে খোকা?

রাবেয়া বলে, 'পলাকে ডাকছিলাম কাকা।'

যাও শুয়ে পড়, পলা কোত্থেকে আসবে এত রাত্তিরে ?

শুতে শুতে রাবেয়া বললো, 'খোকা পলাকে একটা চামড়ার বেল্ট কিনে দেবে ? গলায় বেঁধে দেবো।'

আচ্ছা।

আর একটা লম্বা শিকল কিনে দেবে ?

দেবো।

আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেবে ?

কি জিনিস ?

নাম মনে নেই আমার। দেবে তো ?

আচ্ছা দেবো।

কবে ? কাল ?

না চাকরী হোক আগে।

বাবা বলে উঠলেন, 'কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস তোরা ? ঘুমো, সারাদিন খেটে এসে শুই তাও যদি শান্তি পাওয়া যাও।'

বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি আসলো। সরকারী সিল থাকা সত্ত্বেও কিছুই বুঝতে পারিনি। আর দশটা খাম যেমন খুলি তেমনি আড়াআড়ি খুলে ফেললাম। আমাকে তারা ডাকছেন। রসায়নশাস্ত্রের লেকচারারশীপ পেয়েছি একটি কলেজে। প্রাথমিক বেতন সাড়েচারশ' টাকা, ইয়ারলি পঁচিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট। লেখাগুলি কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। খুব খুশী হয়েছি এমন একটা অনুভূতি আসছিলো না। অথচ আমি সত্যি খুশী হয়েছি এবং আমি সবাইকে সুখী করতে চাই। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাই, রুনুকে গাঢ় সবুজ একটি শাড়ী দিতে চাই, রোল নাম্বার থারটিন এর গায়ে যেমন দেখছি। এখন হয়তো সমস্তই আমার মুঠোয়, তবু সেই অগাধ সুখ, সমস্ত শরীর

জুড়ে উন্মাদ আনন্দ কই? আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলেমানুষি কোন সাধ, কোন বাসনা আমার বাবা মা মিটাতে পারেননি। আমাদের বাসনা তাদের দুঃখই দিয়েছে। আজ আমি সমস্ত বেদনায় সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়োব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি, শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়। 'মা আমার চাকরি হয়েছে।'

মা দৌড়ে এলেন। বহুদিন পর তাঁর চোখ আনন্দে ছল ছল করে উঠলো। বললেন, 'দেখি।' আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। মা পড়তে জানেন না তবু উল্টে পাল্টে দেখলেন সেটি। এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন যেন খুব একটা দামী জিনিস হাতে। মা বললেন,

বেতন কতোরে?

সাড়ে চারশ'।

বলিস কি, এতো?

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, 'বেশী আর কোথায়?' বলেই আমি লজ্জা পেলাম। ভালো করেই জানি টাকাটা আমার কাছে অনেক বেশী। মা বললেন,

এবার বিয়ে করাবো তোকে।

কি যে বলেন।

বেশ একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আনতে হবে। রূপবতী কিন্তু সাদাসিধা, নাহার মেয়েটির মতো।

মা কল্পনায় সুখের সাগরে ডুব দিলেন।

শহরে তুই বাসা করবি?

তাতো করতেই হবে।

বেশ হবে মাঝে মাঝে তোর কাছে গিয়ে থাকবো।

মাঝে মাঝে কেন সব সময় থাকবেন।

নারে বাপু সংসার ফেলে যাবো না।

মা ছেলে মানুষের মতো হাসলেন। আমি বললাম,

প্রথম বেতনের টাকায় আপনাকে কি দেবো মা?

তোর বাবাকে একটা কোট কিনে দিস, আগেরটি পোকায় নষ্ট করেছে।

বাবারটাতো বাবাকেই দেবো, আপনাকে কি?

মা রহস্য করে বললেন,

আমায় একটা টুকটুকে বউ এনে দে।

মাষ্টার কাকাও খবর শুনে খুব খুশী হলেন। তার খুশী সব সময়ই মৌন। এবার একটু বাড়াবাড়ি ধরনের আনন্দ করলেন। নিজের টাকায় প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। অনেক মিষ্টি! যার যত ইচ্ছে খাও। কাকা বললেন, 'সুখ আসতে শুরু করলে সুখের বান ডেকে যায়। দেখো খোকা কত সুখ হবে তোমার।'

রুনু স্কুল থেকে এসে বললো,

দাদা তোমার নাকি বিয়ে?

কে বলেছে রে?

মা, হি হি হি।

খুব হি হি না? তোকে বিয়ে দি যদি?

যাও খালি ঠাট্টা। কাকে তুমি বিয়ে করবে দাদা?

দেখি ভেবে।

আমি জানি কার কথা ভাবছো।

কার কথা?

শীলার কথা নয়?

পাগল তুই!

অবহেলায় উড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারছি আমার কান লাল

হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি বোধ করছি। শীলুকে কেন যে হঠাৎ ভালো লাগলো। যতবার তাকে দেখি ততবার বুক ধ্বক করে ওঠে। একটা আশ্চর্য সুখের মতো ব্যথা অনুভব করি। সমস্ত শরীর জুড়ে শীলু শীলু বলে কারা বুঝি চেঁচায়। আমি একটু হেসে বলি,

কে ভাবে তোর শীলুর কথা ?

না এমনি বলছিলাম, বড় ভালো মেয়ে শীলু।

হুঁ। তুই কাকে বিয়ে করবি রুনু ?

যাও দাদা ভাল হবে না বলছি।

আমার একজন বন্ধু আছে, খুব ভালো ছেলে…

দাদা, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো এবার।

আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে মণ্টু বাদ পড়লো। বড় নানার বাড়ী গিয়েছে সে আগামী কাল আসবে। বাবা আসলেন রাত ন' টার দিকে। মা খবরটা না দিয়ে মিষ্টি খেতে দিলেন বাবাকে।

মিষ্টি কিসের ?

আছে একটা ব্যাপার।

বাবা আধখানা মিষ্টি খেলেন, ব্যাপার জানার জন্যে উৎসাহ দেখালেন না। মা নিজের থেকেই বললেন,

খোকার চাকুরী হয়েছে। সাড়ে চার শ' টাকা মাইনে।

বাবা খুশী হলেন। থেমে থেমে বললেন,

ভালো হয়েছে। আমি চাকরী ছেড়ে দেবো এবার। বয়স হয়েছে আর পারি না। রাবেয়া, রাবেয়া কোথায় ?

ঘুমিয়েছে, শরীর খারাপ।

ভাত খায় নি তো ?

না একটা মিষ্টি খেয়েছে শুধু।

আহ্! বললাম খালিপেটে রাখতে, মিষ্টিইবা কেন দিলে ?

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। রাত একটার দিকে মা পাগলের মত ডাকলেন,

খোকা ও খোকা শীগগীর ওঠ। ও খোকা খোকা।

খুব ছোটবেলায় গভীর রাতে একবার মা এমন ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন। ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন। আমাদের বাসা থেকে চল্লিশ গজের ভিতর নন্দী সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া পুরানো বাড়ী ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। আজকের এই গভীর রাতে মায়ের আতঙ্কিত ডাক আমাকে ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মা বললেন,

আয় আমার ঘরে, আয় তাড়াতাড়ি।

কি হয়েছে ?

মা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। দরোজা খোলা, চোখে পড়লো মায়ের বিছানায় রাবেয়া শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বাবা গরুর মতো চোখে তাকিয়ে আছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এবোরশান নাকি ? কাকে দিয়ে কি করালেন ? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন ? বাবা ধরা ধরা গলায় বললেন,

খোকা তুই মাথায় একটু হাওয়া কর আমি একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসি। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

ডাক্তার আসলেন একজন। গম্ভীর হয়ে ইনজেকশন করলেন।

আপনার মেয়েকে আমি চিনি।

বাবা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন,

বড় দুঃখী মেয়ে, মেয়েটাকে আপনি বাঁচান ডাক্তার।

ডাক্তার সেন্টিমেন্টের ধার দিয়েও গেলেন না। এক গাদা ওষুধ দিয়ে গেলেন। সকালে আরো দুটো ইনজেকশন করতে

বললেন। দশটার দিকে তিনি আসবেন।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কেউ জানবে নাতো ডাক্তার?' ডাক্তার বললেন, 'মান ইজ্জত পরের ব্যাপার আগে মেয়ে বাঁচুক।'

রাবেয়া চিঁ চিঁ করে বললো,

মা আমার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি, সেরে যাবে চুপ করে শুয়ে থাকো।

বুকটা খালি খালি লাগছে কেন?

সেরে যাবে মা, দুধ খাবে একটু?

না।

আমি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরে লম্বালম্বি একটা ছায়া পড়লো। তাকিয়ে দেখি মাষ্টার কাকা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু কাশলেন তিনি। বাবা হাউ মাউ করে কেঁদে বললেন,

শরীফ মিয়া আমার মেয়েটাকে বাঁচাও।

মাষ্টার কাকা মৃদু গলায় বললেন, 'শহর থেকে খুব বড় ডাক্তার আনবো আমি। খোকা তোর সাইকেলটা বের করে দে।' আমি বললাম,

আমি যাই কাকা?

না তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না। তুমি থাকো।

বাবা ধমকে উঠলেন,

ওর কথা শুনো না। ও একটা পাগল ছাগল। তুমি যাও। নিজেই যাও।

রুনু কখন বা এসেছে। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে সে। ঘরময় নষ্ট রক্তের একটা দম আটকানো অস্বস্তিকর গন্ধ। রাবেয়া চোখ বুঁজে শুয়ে। তার মুখটা কি

ফর্সাইনা দেখাচ্ছে। বাবা বললেন,

মা রাবু একটু দুধ খাও।

না।

মাথায় পানি দেবো মা?

না বাবা।

রাবেয়া চোখ মেলে বাবার দিকে তাকালো। বললো,

বাবা।

কি মা?

আমার বুকটা খালি খালি লাগছে কেন?

সেরে যাবে মা।

তুমি আমার বুকে হাত রাখবে একটু? এইখানে।

এমনি করেই ভোর হলো। মন্টু এলো ছটায়।

সে হতভম্ব হয়ে গেলো। বাবা গিয়েছেন ইনজেকশন দেবার লোক আনতে। রাবেয়া মন্টুর দিকে তাকিয়ে বললো,

মন্টু আমার অসুখ করেছে।

মন্টু বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। রাবেয়া আবার বললো,

মন্টু আমার বুকটা খালি খালি লাগছে।

মন্টু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলো। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। রুনু আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমাট বাঁধা কালো রক্তে। রাবেয়া আমাকে ডাকলো, 'খোকা ও খোকা।'

আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। নীল রঙের চাদরে ঢাকা রাবেয়ার শরীর নিস্পন্দ পড়ে আছে। একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভন ভন করছে। রাবেয়া হঠাৎ করেই বলে

উঠলো, 'পলাকেতো দেখছিনা। ও খোকা পলা কোথায় রে ?' আমাদের চারদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে পলাকে খুঁজলো সে। আর কি আশ্চর্য বেলা ন'টায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারিদিকে শীতের ভোরের কি ঝক্ ঝকে আলো।

গত বৎসর আমরা বড় খালার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড় খালার মেয়ে নিনাও এসেছিলো মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতী মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা আপা কি প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে, তার কি প্রগাঢ় আনন্দ চোখে মুখে। 'যদি ছেলে হয় তবে তার নাম দেবো কিংশুক, মেয়ে হলে রাখী।' হেসে হেসে বলে উঠেছিলেন নীনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিলো, 'আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখবো।' আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস। হলুদ রোদ এসে পড়ছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিশে গেছে। যে বুক একটু আগেই খালি খালি লাগছিলো।

বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাষ্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মণ্টু, দিনে দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা ফালা করে ফেললো মাষ্টার কাকাকে একটা মাছ কাটা বটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এলো দুতিন জন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এলো। ওভারশীয়ার কাকুর বড় ছেলে জসীম দৌড়ে এলো। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, 'হেল্প ! হেল্প !' চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বটি হাতে মণ্টু দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলেছে নালায়। মণ্টু আমার

দিকে তাকিয়ে বললো, 'দাদা ওকে আমি মেরে ফেলেছি।' আমার মনে পড়লো হাস্নুহেনা গাছের নীচে মন্টু একদিন পিটিয়ে একটা মস্ত সাপ মেরেছিল।

রবেয়াকে ঘিরে সবাই বসে ছিলো। আমি ঢুকতেই নাহার ভাবী বললেন, 'বাইরে এত গোলমাল কিসের?'

আমি মায়ের দিকে তাকালাম।

মা এইমাত্র মন্টু মাষ্টার কাকাকে খুন করেছে। আপনি বাইরে আসেন। মন্টুকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

হাস্নুহেনা গাছের নীচে মন্টু একটা মস্ত চন্দ্র বোড়া সাপ মেরেছিলো। সাপের মাথায় গোল বেগুনী রংএর চক্র। চার হাতের উপর লম্বা। মন্টু মরা সাপটাকে কাঠির আগায় নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছোট বাচ্চারা উল্লাসে লাফাতে লাগলো রাবেয়া খুশীতে হেসে ফেলে বললো,

মন্টু কাঠিটা আমার হাতে দে।

পলা আনন্দে ঘেউ ঘেউ করছিলো। মাঝে মাঝে লাফিয়ে সাপটাকে কামড়াতে গিয়ে ফিরে ফিরে আসছিলো। রাবেয়া পলার দিকে তাকিয়ে শাসালো,

এই পলা এই, মারবো থাপ্পড়।

সাপটাকে সবাই মিলে পুকুর পাড়ে কবর দিতে নিয়ে গেলো। মিছিলের পুরোভাগে রাবেয়া। তার হাতের কাঠিতে সাপটা আড়াআড়ি ঝুলছে। মন্টু পলাকে নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলো। সাপের জন্য লম্বা করে কবর খোড়া হলো। মন্টু পুকুর পাড়ে বিষন্নভাবে বসেছিলো।

কাকাকে মেরে ফেলবার পর মন্টুকে সবাই জাপটে ধরে রেখেছিলো। জসীম মন্টুর হাত শক্ত করে ধরে চেঁচাচ্ছিল,

'পুলিশে খবর দিন। পুলিশে খবর দিন।' মাছ কাটার বটিটা কাত হয়ে ঘাসের উপর পড়ে। সেখানে একটুও রক্তের দাগ নেই। কাকা যেখানে পড়েছিলেন সেখান থেকে একটা মোটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যাচ্ছিল। মন্টু আমায় দেখে বললো, 'দাদা ওকে আমি মেরে ফেলেছি।' মন্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। আশেপাশে প্রচুর লোক জমা হয়ে গিজ গিজ করছিলো। মোটা ডাক্তার ভাঙ্গা গলায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিলেন, 'হেল্প! হেল্প!' একটা পাংশুটে রঙের কুকুর মরা লাশটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করেছিলো।

মন্টুর কুকুরের রং ছিলো সাদা। গলার কাছে কালো একটা ফুটকি। মন্টু কাঞ্চনপুর থেকে এনেছিলো কুকুরটাকে। অল্প দিনেই ভীষণ পোষ মেনেছিলো। মন্টু তাকে টুলকাঠ দিয়ে একটি চমৎকার ঘর বানিয়ে দিয়েছিলো। আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম পলা। রাবেয়া মন্টুর কাছ থেকে কুকুরটা আট আনা দিয়ে কিনে নিয়েছিলো। মন্টুর বিক্রির ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু রাবেয়া পীড়াপীড়ি করছিলো,

মন্টু পলাকে আমি কিনব।

না আপা, আমি পলাকে বেচবো না।

আহা দেনা মন্টু। আট আনা পয়সা দেবো আমি। দে না।

বললাম তো আমি বেচবো না।

মন্টু দিয়ে দে, এমন করছিস কেন?

রাবেয়া সব সময় পলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। পরিচিত ঘর বাড়ীতে গিয়ে বলতো, 'খালাম্মা আমার পলাকে একটু দুধ দিন। আহা চিনি দিয়ে দিন। শুধু শুধু দুধ বুঝি কেউ খায়?'

মন্টু একদিন একটা টিয়া পাখীর বাচ্চা আনলো কোথা থেকে। সেটি বাচ্চা হলেও খুব চমৎকার ছিল দেখতে। বারান্দায়

খাঁচা ঝুলিয়ে পাখীটিকে রাখা হোত। ঠাণ্ডা লেগে একদিন সেটি মারা গেল। মন্টু পাখীর শোকে একবেলা ভাত খেলো না।

মন্টু আর মাষ্টার কাকা সবচে' ছোট ঘরটায় থাকতেন। ঘরটায় আলো আসতো না ভালো। গরমের সময় গুমোট গরম। বাতাস আসার পথ নেই। মন্টুর হাজত বাসের দিনগুলি এখন কেমন কাটছে? মন্টুর বয়স এখন উনিশ, সাত বাদ দিলে হয় বারো। বারো বৎসর সে আর মাষ্টার কাকা এক সঙ্গে একটি ঘরে কাটিয়েছে। মাষ্টার কাকার অভাব সে অনুভব করছে কি? খুনের পর শুনেছি অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। দিন রাত্তির খুন করা লোকের চেহারা, খুনের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মন্টুর সে রকম হবে না। তার বড় শক্ত নার্ভ। মন্টুর মা, আমাদের বড় মা যেদিন মারা গেলেন মন্টু সেদিন নিতান্ত সহজভাবেই কাটালো। পরদিন শিমুলতলা গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলো বাসায় কাউকে না বলে। বয়স অল্প ছিল। শোক বুঝবার বুদ্ধিই হয়ত হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় কম বয়সের জন্যে নয়। বড় মার মত তারও ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ ছিলো। মন্টু দেখতে অনেকটা বড় মার মতো। তার চাইবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্তই বড় মায়ের মতো। বাবার শোবার ঘরে বড় মা আর বাবার একটা যৌথ ছবি আছে। বিয়ের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকালেই মন্টুকে চেনা যায়। ছবির কাঁচে ময়লা জমে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বড় মার বালিকা বয়সের ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। চৌঠা আগস্ট আমাদের বাসায় একটা উৎসব হয়। ভুল বললাম, শোকের আসর হয়। বাদ মাগরেব মিলাদ পড়ানো হয়। বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করেন। দু'একটি ফকির মিসকিনকে খাওয়ানো হয়। হাউ মাউ করে বাবা মায়ের মৃত্যু দিন স্মরণ

করে কিছুক্ষণ কাঁদেন। তার শোকটা নিশ্চয়ই আন্তরিক, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে এই দিনটিতে মা মুখ কালো করে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়ান। তার ভাব দেখে মনে হয় চৌঠা আগস্টের এই শোকের দিনটির জন্যে মা নিজেই দায়ী। বাবা সেদিন অতি সামান্যতম অতি তুচ্ছতম ব্যাপারেও মায়ের উপর ক্ষেপে যান। আমার কষ্ট হয়। বড় মা আমাদের সবারই অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমুতে পারিনি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন,

খোকা আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমুবার জন্যে এত হৈ চৈ করতিস এখন যে বড় চুপচাপ ?

বড় হয়েছি যে।

ওহ কি মস্ত বড় ছেলে।

বড় মার গলা জড়িয়ে তাঁর বরফি কাটা ছাপের ব্লাউজে নাক ডুবিয়ে প্রতি সন্ধ্যার আবদার, 'গল্প বলেন বড় মা। ভূতের গল্প।'

বড় মা কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গল্প বলতেন, 'আমরা তখন ছোট। বারো তেরো বৎসরের বেশী বড় নয়। নানার বাড়ী যাচ্ছি সবাই। ভাদ্র মাস, নদী কানায় কানায় ভরা। সারাদিন নৌকা চললো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝিরা পুরানো এক তাল গাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে রান্না বসিয়েছে। এমন সময় রুস্তম বলে যে বুড়ো মাঝিটা ছিল তার সে কি বিকট চিৎকার, 'কর্তা তাল গাছে এটা কি ?' আমি শুনেই বাবাকে জাপ্টে ধরেছি। তাল গাছের দিকে চাইবার সাহস নেই।' বলতে বলতে মা থামতেন। আমরা ফুঁসে উঠতাম,

থামলে কেন, বল শিগ্‌গীর।

গল্প শুনে আতঙ্কে জমে যেতাম। কি অদ্ভুত তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। বড় মার মৃত্যুর দিনটিতে বাবার হৈ-চৈ আমার তাই ভালো লাগতো না। আমার মনে হতো আড়ম্বরের চেয়ে মৌন দুঃখানুভূতিই হয়তো ভালো হতো। আমি মনে মনে বললাম,

বড় মা তোমার ছেলের আজ বড় বিপদ।

হ্যাঁ, আজ মণ্টুর বড় বিপদ। বড় ভয়ংকর বিপদ। মণ্টু কি বড় মাকে ডাকছে? ফুটবলের খুব নেশা ছিল মণ্টুর। খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ছেলেদের কাঁধে চড়ে বাসায় এলো। হাঁটুর নীচে আধ হাত খানেক জায়গা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। হৈ চৈ শুনে বড় মা বেরিয়ে আসতেই মণ্টু বললো,

মা আমি পা ভেঙ্গে ফেলেছি।

বড় মা বললেন, 'সেরে যাবে।'

মণ্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। এক্সরে করে দেখা গেল ভেতরে হাড়ের একটা ছোট ছোঁচালো কণা ভেঙ্গে রয়ে গেছে। কেটে বের করতে হবে।

মণ্টুকে সাদা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। এনেসথেসিয়া করার বড় চোকা ধরণের যন্ত্রটা ডাক্তার মণ্টুর মুখের কাছে নামিয়ে আনলেন। ছোট্ট মণ্টু আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো। ডাক্তার বললেন, 'বলো খোকা বলো, এক দুই তিন চার···।' মণ্টু বললো, 'মা, মা, মা, মা।'

আজ মণ্টুর বড় বিপদ। দুর্গন্ধ কম্বলে মাথা চাপা দিয়ে আজো কি সে মা মা জপছে? না, মণ্টু বড় শক্ত ছেলে। ইস্পাতের মতো তার নার্ভ। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,

তুমি আকন্দকে খুন করেছো?

জ্বী।

কি দিয়ে?

বটি দিয়ে, মাছ কাটা বটি।

ক'টা কোপ দিয়েছিলে?

মনে নেই।

মরবার সময় তিনি কিছু বলেছিলেন?

জ্বী।

কি বলেছিলেন?

বাবা মন্টু।

আর কিছু বলেন নি?

না।

তিনি কি তোমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন?

জ্বী ছিলেন।

তুমি কি কর?

বি. এ. পড়ছিলাম।

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। এবার শুরু করলেন আপনি করে।

কি জন্যে খুন করেছেন তাকে?

মন্টু চুপ করে রইলো। দারোগা সাহেব বললেন, আমাকে বলতে কোন অসুবিধা নেই। কোর্টে অন্যকথা বললেই হলো। বাঁচার অধিকারতো সবারই আছে? ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক কোন স্ক্যাণ্ডাল……

ছিঃ।

আমার মনে হয় আপনি মিথ্যা বলছেন।

আমি মিথ্যা বলি না।

মন্টু খুব স্পর্ধার সঙ্গে বললো আমি মিথ্যা বলি না। বলতে

গিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেবের মাথার ওপর একটা ফ্যান ঘুরছিলো। ফ্যানের বাতাসে মন্টুর চুল কাঁপছিলো। আমি কাঁচু মাচু হয়ে ভদ্রলোকের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মন্টু কি কখনো মিথ্যা বলে না? মন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ হয় না। সে জন্ম থেকেই নীরব। তাকে বোঝা হয়ে ওঠে নি আমার। রুনু সম্বন্ধে আমি যেমন বলতে পারি রুনুর একটু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যখন সে মিথ্যা বলে তখন সে মাথা নীচু করে অল্প অল্প হাসে। মন্টু সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারছি না আমি।

আপনি কি খুব ভেবে চিন্তে খুন করেছেন?

না খুব ভাবি নি।

আমার মনে হয় আপনি খুব অনুতপ্ত?

না।

তাকে খুন করার ইচ্ছে কি হঠাৎ আপনার মনে জেগেছে না আগে থেকেই ছিলো?

হঠাৎ জেগেছে।

তিনি কোন ধরনের লোক ছিলেন?

ভালো লোক। বিদ্বান, অনেক জানতেন।

আপনাদের সঙ্গে তার কি ধরনের সম্পর্ক ছিল?

ভালো। আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

তাকে খুন করা কি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো?

জানি না। আমার রাগ খুব বেশী।

হ্যাঁ মন্টুর রাগ বেশী। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রাগ। আমি জানি, এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানি। দু' বৎসর হয়নি এখনো। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছি, সময়ও মনে আছে পৌষ মাস। দারুণ

শীত। আমাদের সামনের বাসায় থাকতেন এক ওভারশীয়ার সাহেব। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে সব মিলিয়েই একজন, মীনা। বয়স আমার সমান কিংবা আমার চেয়ে দু'এক বৎসরের বড়। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকের ভারী আদরের মেয়ে, সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। মেয়েটি বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতো বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোক একদিন হাতে একটি চিঠি নিয়ে চড়াও হলেন আমাদের বাসায়। আমি বাইরেই বসেছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

এই চিঠি তুমি লিখেছ?

নামহীন একটা চিঠি তিনি আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

কি বলছেন আপনি?

নিশ্চয়ই তুমি, এত বড় সাহস তোমার এমন নোংরা কথা আমার মেয়েকে লিখেছ।

ভদ্রলোক গর্জাতে লাগলেন। আমি হতভম্ব এবং ভীষণ লজ্জিত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক ধরনের ছেলে। এ ধরনের অভিযোগে একেবারে বোকা বনে গেলাম।

তুমি কি মনে করেছ আমি ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মেয়েছেলের মান-ইজ্জত···

কথা শেষ হবার আগেই মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শান্ত গলায় বললো, 'যান, আপনি বাড়ী যান।'

বললেই হোল, যা ইচ্ছে তা লিখে বেড়াবে আর আমি বসে বসে কলা চুষবো?

মন্টু নিমিষের মধ্যে, আমার কিছু বুঝবার আগেই ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরলো। হুংকার দিয়ে বললো, 'চুপরাও ছোটলোক।' মা বেরিয়ে এলেন। আশে পাশে লোক জমে

গেলো। আমি তটস্থ। মন্টু চেঁচাতে লাগলো,

তুনিয়া শুদ্ধ লোক জানে তোমার মেয়ের কারবার আর তুমি এসেছো দাদার কাছে?

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বদলী হয়ে চলে গেছেন রাজশাহী। মেয়েকে নিশ্চয়ই কোথাও বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখানে থাকলে মন্টুর উন্মাদ রাগের পরিণতি দেখে খুশী হতেন হয়তো।

মাষ্টার কাকার বাড়ী থেকে লোক এলো একজন। দড়ি পাকানো চেহারা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ছুঁচালো দাড়ি। চোখে নিকেলের চশমা।

শরীফ আকন্দের ভাই আমি। বড় ভাই। তার জিনিস পত্র টাকা পয়সা যা আছে নিতে এসেছি।

আমি বললাম,

জিনিসপত্র বিশেষ নেই, তবে অনেক বই আছে।

টাকা পয়সা কি আন্দাজ আছে?

তুশ পনেরো টাকা ছিল।

মাত্র! তবে যে শুনলাম বহু টাকা। টাকার জন্যেই খুন করা হয়েছে।

লোকটি কুঁত কুঁতে চোখে তাকাচ্ছিল। পান চিবানো ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়া লালা টেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বললো,

আপনারা যা বলবেন এখন তো তাই সত্যি। তা সে টাকা কটাই দিন। আসতেই আমার পঁচিশ টাকা খরচ।

তাঁর সব কিছুই থানায়। আপনি সেখানেই যান।

কই?

থানায়।

অ।

ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। রুনু বললো,

দাদা ওকি সত্যি মাষ্টার কাকার ভাই ?

হুঁ।

কি করে বুঝলে ?

এক রকম চেহারা।

মাষ্টার কাকার চেহারা আমার মনে আছে। গত পরশু শেষ রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। বড় মাকেও দেখেছি। বড় মা অবাক হয়ে বলছেন,

তুই এই হলুদ রঙের শাড়ী আনলি আমার জন্যে খোকা ? এই শাড়ী পরার বয়স কি আছে রে বোকা ?

বেতন পেয়ে সবার জন্যেই কিছু না কিছু কিনেছি। আপনি নেন এটা।

সবার জন্যেই কিনেছিস ?

জ্বী।

কি কি কিনলি ?

আমি নাম বলে চললাম। বড় মা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন,

সবার জন্যেই কিনলি, মাষ্টারের জন্যে কিনলি না ? সে বাদ পড়লো বুঝি ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জানেন না, মাষ্টার কাকা তো মারা গেছেন ?'

আহা কি করে মারা গেল ? বড় ভালো লোক ছিল।

বড়মা মাষ্টার কাকাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রায়ই আলাপ করতেন তাঁর সাথে। মাষ্টার কাকা বড় মাকে বড় বোনের মত দেখতেন। আমার মাকে ভাবী বলে ডাকলেও বড়

মাকে ডাকতেন বড় বুবু বলে। বড় মা প্রায়ই বলতেন,

ও মাষ্টার আমার ভাগ্যটা গুণে দিলে না ?

বড় বুবু আপনাদের সবার ভাগ্যই আমি গুণে রেখেছি।

ছাই গুণেছেন। বলুন আমার ভাগ্য।

আপনার জন্ম লগ্নে আছে মঙ্গল আর রবির প্রভাব। সৌভাগ্যবান আপনি। ভাগ্যবান ছেলে হবে আপনার।

বড় মা হো হো করে হেসে উঠতেন।

মাথার ঠিক নাই তোমার। এই তোমার ভাগ্য গণনা ? এই সব বুঝি লেখে বই এ। পুড়িয়ে ফেলো তোমার বই। না হয় আমাকে দিও আমি আগুন করে তোমাকে চা বানিয়ে দেবো।

কাকা বিমর্ষ হয়ে বই এর পাতা ওল্টাতেন। এইখানেই তাঁর গণনা মিলতো না। বাবা বড় মার ছেলে হওয়ার কোন আশা না দেখেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন।

আশ্চর্যভাবে কাকার গণনা মিলে গেলো এক সময়। রুনুর জন্মের পাঁচ বৎসর আগেই বড় মার কোলে এলো মন্টু। বড় মা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন কাকার নির্ভুল গণনা দেখে। কাকাকে ডেকে বলেছিলেন,

আমার ছেলের ভাগ্যটা একটু দেখো মাষ্টার। আশ্চর্য এসব শিখলে কি করে ? আমার খুব শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মাষ্টার কাকা হেসে বলেছিলেন, 'এও এক ধরনের বিজ্ঞান বুবু। অন্ধকার বিজ্ঞান। আপনি যদি সত্যি শিখতে চান……'

বড় মা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলেন, 'আগে আমার ছেলের ভাগ্য বলো। তারপর তোমার অন্ধকার বিজ্ঞান।

কাকা বললেন, 'জন্ম হয়েছে মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে। জন্ম সময় আকাশে কুন্তলান। জাতক শনির ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে শুক্রের সপ্তমাংশে…'

আহা কি আবোল তাবোল শুরু করলে, ফলাফলটা বলো।

ছেলে বুদ্ধিমান, সাহসী শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্য-বান ছেলে আপনার। তাকে একটা গোমেদ পাথর দেবেন বুবু, খুব কাজে লাগবে।

বড় মা মণ্টুকে এগারো বৎসরের রেখে মারা গেলেন। মণ্টুর জন্যে গোমেদ পাথর আর নেওয়া হলো না। সেই পাথর যদি থাকতো তবে কি এই বিপদ এড়াতে পারতো মণ্টু ?

আদালতে কৌতুহলী মানুষের ভীড়।

জজসাহেবকে মনে হলো বিশেষ কিছু শুনছেন না। সিগারেটের ধুঁয়া, ঘামের গন্ধ, লোকজনের মৃদু কথাবার্তা সব মিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশ। গুমোট গরম যদিও মাথার উপর দুটি নড়বড়ে রং উঠা ফ্যান কঁ্যা কঁ্যা শব্দ করে ঘুরছে। কালো গাউন পরা উকিলরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। মণ্টু সরাসরি তাকিয়ে আছে সামনে। বাবা, আমি আর রুনু বসে আছি জড়সড় হয়ে। মণ্টুকে দেখলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে কয়েক-বার কাশলো।

আপনি বলছেন খুন করার ইচ্ছে হঠাৎ হয়নি, কিছুদিন থেকেই মনে ছিলো।

হ্যাঁ।

কতদিন থেকে ?

কতদিন থেকে আমার মনে নেই।

কিন্তু কি কারণে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে হলো ?

কারণ আমার মনে নেই।

আপনি অসুস্থ ?

না আমি সুস্থ।

ক্রস্ একজামিনেসনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে

পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকালো তাঁর দিকে। আদালতের মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠলো। জজ সাহেব বললেন, 'অর্ডার অর্ডার।' তার কিছুক্ষণ পরই আদালত সেদিনের মত মুলতবী হয়ে গেলো। মা কাঁপা গলায় বললেন, 'বিচার শেষ হবে কবে খোকা?'

চারিদিকে বড় বেশী নির্জনতা। বড় বেশী নীরবতা। মন্টুর ঘরে বাবা একটা তালা লাগিয়েছেন। রুনুর বিছানায় রুনু একা একা অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। বাতি জ্বালানো থাকলে আগে ঘুমুতে পারতো না সে। এখন সারারাত বাতি জ্বলে। হারিকেনের আবছা আলোয় সমস্তই কেমন ভূতুড়ে দেখায়। ঘরের দেয়ালে আমার মাথার একটা প্রচণ্ড কালো ছায়া পড়ে। মাঝে মাঝে বাবা গোঙ্গানীর মত শব্দ করে কাঁদেন। রুনু আৎকে উঠে বলে, 'কি হয়েছে দাদা?' আমি চুপ করে থাকি।

রুনু আবার বলে, 'দাদা কি হয়েছে?'

বাবা কাঁদছেন।

বাবা গোঙ্গানীর মত শব্দ করে কাঁদেন। বারান্দায় কি অপরূপ জ্যোৎস্না হয়। হাস্নুহেনার সুবাস ভেসে আসে। রুনু বলে, 'মরার পর কি হয় দাদা?'

আমি উত্তর দেই না। মনে মনে বলি, কিছুই হয় না। সব শেষ। সে জীবন দোয়েলের হরিণের হয়নিকো দেখা···। অসংলগ্ন কত কথাই মনে আসে।

দাদা মন্টু ভাই এর কি হবে?

জানি না।

ঘরের দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুক

হু হু করে। নাহার ভাবী মৃদু ভল্যুমে গান শুনেন, 'বিধি ডাগর আঁখি যবে দিয়েছিলে, মোর পানে কেন পড়িল না।' কান পেতে শুনি।

মাঝে মাঝে নাহার ভাবী আসেন আমার ঘরে। বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকেন। সেদিনও এসেছিলেন। আমি জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। বাইরে কি তুমুল বৃষ্টি। বিকেলের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে আগে ভাগে। নাহার ভাবী রুনুর বিছানায় এসে বসলেন।

আমি পরশু চলে যাচ্ছি।

আমি চমকে বললাম, 'কোথায়?'

প্রথমে বাবার কাছে যাব। সেখান থেকে বাইরেও যেতে পারি দাদার সঙ্গে, ও চিঠি লিখেছে যেতে।

আমি চুপ করে রইলাম। নাহার ভাবী বললেন,

আপনাদের কথা খুব মনে থাকবে আমার। আপনাদের সবাইকে আমার বড় ভালো লেগেছে। রাবেয়ার কথা খুব মনে হয় আমার।

নাহার ভাবী চোখ মুছলেন। রুনু চা নিয়ে আসলো দু কাপ। নাহার ভাবী চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা গলায় হঠাৎ করেই বললেন,

আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মন্টু এমন কাজ কেন করলো বলবেন? অনেকে অনেক কথা বলে। আমার খারাপ লাগে শুনে। আপনাদের আমি বড্ড ভালবাসি।

আমি বললাম,

রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটাতো আপনি জানেন ভাবী।

জানি।

কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি

মণ্টু বলেনি কিছুই।

মণ্টুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি সব সময় তার জন্যে দোয়া করবো। তাকে আমি ভালো করে দেখিওনি কোনদিন।

ভাবী, মণ্টু বড় চুপচাপ ছেলে।

আমার দোয়ায় কিছু হবে না। তবু আমি তার জন্যে দোয়া করবো।

নাহার ভাবী মাথা নীচু করে বসেছিলেন। আমার মনে হলো নাহার ভাবী আমাদের বড় আপন। বড় পরিচিত।

রাবেয়ার একটা ছবি দেবেন আমাকে?

ছবি?

জী আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও খুশী হোত দেখলে। রাবেয়াকে তার খুব ভালো লেগেছিল।

ওরতো কোন ছবি নেই। আমাদের সবার শুধু একটা গ্রুপ ছবি আছে, মণ্টুর জন্মের পর তোলা।

অ।

নাহার ভাবী চলে গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলে ছবি বের করলাম আমি। পুরানো ছবি। হলুদ হয়ে গেছে। তবু কি জীবন্তই না মনে হচ্ছে। রাবেয়া হাসি মুখে বসে আছে মেঝেতে। রুনু বাবার কোলে। মণ্টু চোখ বুঁজে বড়মার কোলে শুয়ে। বুকে গভীর বেদনা অনুভব করছি। স্মৃতি সে সুখেরই হোক বেদনারই হোক সব সময়ই করুণ।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বললো,

মনে আছে দাদা, একরাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিলো, তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে।

আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে

হারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ করে বিকৃত গলায় ডাকলেন, 'খোকা ও খোকা।'

কি বাবা।

আয়। তুই আমার কাছে আয়। মণ্টুর জন্যে বুকটা বড় কাঁদে রে।

তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠলো।

সতেরোই আগস্ট মণ্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। মণ্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে। কাকা বলেছিলেন এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।

মণ্টুর জীবন ভিক্ষা চেয়ে আমরা মার্সি পিটিশন করলাম। আমার মনে পড়লো ফাঁসির হুকুম হওয়ার আগের দিনটিতে রোগা, শ্যামলা একটি মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলো। তার মুখটা নিতান্তই সাদাসিদা, ছেলে মানুষী চাহনি। মেয়েটি রিক্সা থেকে নেমেই থতমত খেয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে ঢোক গিললো। বললাম, 'কার খোঁজ করছেন?'

মেয়েটি মাথা নীচু করে কি ভাবছিলো। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বললো, 'আমার নাম ইয়াসমীন। আমি আপনার ভাই এর সাথে পড়ি।'

মণ্টুর সঙ্গে?

জী।

আস ভেতরে আস। তুমি করে বললাম কিছু মনে করো না।

মেয়েটি হেসে বললো,

আমি কত ছোট আপনার, তুমি করেইতো বলবেন।

বাবা, মা আর রুনু মন্টুকে দেখতে গিয়েছেন। আমি মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে বসালাম।

বসো।

এখানে কে শোয়?

আমি আর রুনু।

রুনু কোথায়?

মন্টুকে দেখতে গিয়েছে। বাবা আর মাও গিয়েছেন।

আরো আগে আসলে আমিও রুনুর সঙ্গে যেতে পারতাম, না?

তুমি যেতে চাও?

জ্বী না। ওর খারাপ লাগবে।

মেয়েটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘর দেখতে লাগল। আমি বললাম, 'চা খাবে?'

জ্বী না।

কোথায় থাকো তুমি?

উই খানে।

মেয়েটি হয়তো বলতে চায় না সে কোথায় থাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে বললো, 'আমি সব জানতাম, অনেক ভেবেছি আসি। কিন্তু সাহস হয়নি।'

এসে কি করতে?

না কি আর করতাম। তবু হঠাৎ ইচ্ছে হোত। আমি আপনাদের সবাইকে চিনি। ও আমাকে বলেছে।

কি বলেছে?

মেয়েটি মুখ নীচু করে হাসলো। বললো,

আপনাদের একটা কুকুর ছিল, পলা।

হ্যাঁ শুধু পলাতক হোত তাই তার নাম পলা।

আচ্ছা ওর কি সাজা হবে।

বারো তেরো বৎসরের সাজা হবে হয়তো।

ফাঁসি হবে নাতো ?

না। উকিল বলেছেন কম বয়স, আর রাগের মাথায় খুন।

ওর বুঝি খুব রাগ ?

তোমার কি মনে হয় ?

মেয়েটি হাসলো কথা শুনে। বললো,

জানি না। আমি যাই।

আবার এসো।

আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো আমার।

কেন ?

ও আপনাকে খুব ভালবাসতো। আমার কাছে সব সময় বলতো আপনার কথা।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। ও তো মিথ্যে বলে না।

মেয়েটি চলে গেলো। মন্টু আমাকে হয়তো খুব শ্রদ্ধা করতো। বড় চাপা ছেলে বুঝবার উপায় নেই তবে শ্রদ্ধা করতো ঠিকই। না শ্রদ্ধা নয় ভালবাসা বলা যেতে পারে।

মনে পড়লো একদিন সন্ধ্যায় রুনু এসে আমায় বললো,

দাদা মন্টু আজ বাসায় আসবে না। আমায় বলে দিয়েছে। সে কাঁঠাল গাছে বসে আছে।

কেন রে ?

ও সার্ট ছিড়ে ফেলেছে মারামারি করে। তাই আমায় বলেছে তুমি যদি ওকে আনতে যাও তবেই আসবে।

প্রবল ভালবাসা না থাকলে সন্ধ্যাবেলা বসে কেউ প্রতীক্ষা

করে না। কখন বড় ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

মণ্টুর চলে যাবার পরপরই বাবা মণ্টুর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কতদিন আর হলো মণ্টু গিয়েছে, তবু মনে হয় অনেক দিন ধরেই এই ঘরে একটি মাষ্টার-লক ঝুলে আছে। একটু আগে যে মেয়েটি এসেছিলো সে মণ্টুর ঘর দেখতে চায়নি। কে জানে সে ঘরের কোথায়ও হয়তো এই মেয়েটির লেখা দু-একটা চিঠি মলিন হয়ে পড়ে আছে। আমি মণ্টুর ঘরের তালা খুলে ফেললাম। পশ্চিম দিকের জানালা খুলতেই এক চিলতে হলুদ রোদ এসে পড়লো ঘরে। পাশাপাশি দুটি চৌকি। কাকার জিনিষপত্র কিছু নেই সমস্তই পুলিশ সিজ করে নিয়েছে। মণ্টুর বিছানা, কভার ছাড়া বালিশ, দড়িতে ঝুলানো সার্ট পেন্ট সব তেমনি আছে। বাঁশের তৈরী ছাপড়ায় সুন্দর করে খবরের কাগজ সাঁটা। ঝুঁকে পড়ে তাকাতেই নজরে পড়লো টিপ কলম দিয়ে লিখে রেখেছে 'দিন যায় দিন যায়।' কি মনে করে লিখেছিলো কে জানে।

সতেরো তারিখ মণ্টুর ফাঁসির হুকুম হলো। ঠাণ্ডা মাথায় খুন; অনেক আই উইটনেস। কলেজে পড়া বিবেক বুদ্ধির ছেলে। জজ সাহেব অবলীলায় হুকুম করলেন।

সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ মার্সি পিটিশন অগ্রাহ্য হলো। আমি জানলাম আঠারো তারিখ ভোর রাতে তার ফাঁসি হবে। তার লাশ নিতে হলে সেই সময় জেল গেটের সামনে জেলারের চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাবা, মা আর রুনুকে নিয়ে মণ্টুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

রোগা হয়ে গিয়েছে মণ্টু। আমাদের দেখে অপ্রকৃতস্থের মতো হাসলো। বললো, 'দাদা মার্সি পিটিশনটার কোন জবাব এসেছে?'

ওকে বুঝি সে কথা জানানো হয়নি? ভালই হয়েছে। আমি বললাম, 'নারে এখনো আসেনি।'

মা, রুনু আর বাবা কাঁদছিলেন। মণ্টু বললো,

কাঁদেন কেন আপনারা? আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না। কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বলছেন, 'খোকা ভয় পাস কেন? তোর ফাঁসি হবে না।'

আমি বললাম, 'মণ্টু তোর কাছে একটি মেয়ে এসেছিলো। রোগা লম্বামতো।'

মণ্টু বললো, 'ও ইয়াসমীন, আমার সঙ্গে পড়ে।'

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মণ্টু নীরবতা ভঙ্গ করে রুনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো,

রুনু মিয়া মরতে ইচ্ছে হয় না।

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন,

তোকে কি খেতে দেয়রে?

ভালোই দেয় বাবা। আগে আজে-বাজে দিত। কদিন ধরে রোজ জানতে চায় 'আজ কি দিয়ে খেতে চান?' এ জেলের জেলার খুব ভাল মানুষ বাবা, আমাকে শিবরামের একটা বই পাঠিয়েছেন, যা হাসির!

মা বললেন, মণ্টু বাসার কোন জিনিস খেতে ইচ্ছে হয় তোর?

না মা এখানে এরা বেশ রাঁধে।

সেপাই এসে বললো, 'অনেকক্ষণ হয়েছে তো; আরো কথা বলবেন?' বাবা বললেন, 'না।' বাবা মণ্টুর হাতে চুমু খেলেন কয়েকবার। মণ্টু কাশলো বারকয়। সে মনে হলো

একটু লজ্জা পাচ্ছে। বের হয়ে আসছি হঠাৎ মণ্টু ডাকলো,

দাদা তুমি একটু থাকো।

আমি ফিরে এসে মণ্টুর হাত ধরলাম। মণ্টু কিছু বললো না। আমি বললাম, 'কিছু বলবি ?'

না।

ইয়াসমীনের কথা কিছু বলবি ?

না না।

তবে ?

মণ্টু অল্প হাসলো। বললো,

তোমাদের আমি বড় ভালোবাসি দাদা।

গাছের নীচে ঘন অন্ধকার। কি গাছ এটা ? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখী বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভিতরেই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দু'টি আগুনের ফুলকি উঠা নামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়া ছায়া মূর্তি মনে হয়। জেলখানার মাথায় গেটের ঠিক উপরে একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা। বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভীড় করছে। বাবা বললেন, 'খোকা ক'টা বাজে ?'

বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মণ্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মণ্টুকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নেবো। ঘরে, যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁসাঘেসি করে বসে আছি সিমেন্টের

ঠাণ্ডা বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ। বাবা নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাচ্ছিলেন ক'টা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হাস্নুহেনা গাছে কি ফুলই না ফুটতো। আমাদের বাসার সামনের মাঠে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সেখানে অসংখ্য জোনাকী জ্বলতো আর নিবতো। 'জোনাকী ঝিকিমিকি জ্বালো আলো' গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবী।

আমাদের পলার নাকটা ছিল সিমেন্টের মেঝের মতই ঠাণ্ডা। মন্টু বলেছিল, 'দাদা কুকুরের নাক এত ঠাণ্ডা কেন?'

মাষ্টার কাকা বাইরে বসে বসে আকাশের তারা দেখতেন। বলতেন, 'খোকা, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি।'

রাবেয়া একদিন রাগ হয়ে বলেছিলো, 'মা, আমি সবার বড় কিন্তু কেউ ঈদের দিন আমাকে সালাম করে না।'

আমি আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছি। আমার শীত করছে। বাবা ভারী গলায় ডাকলেন, 'খোকা, খোকা।'

কি বাবা?

ক'টা বাজেরে?

আমি বাবার হাত ধরলাম। কি শীতল হাত। বাবা থর থর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা কা করে ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেলো।

ভোরে হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।